ছোটদের সংগীতশিল্পী আব্বাসউদ্দীন

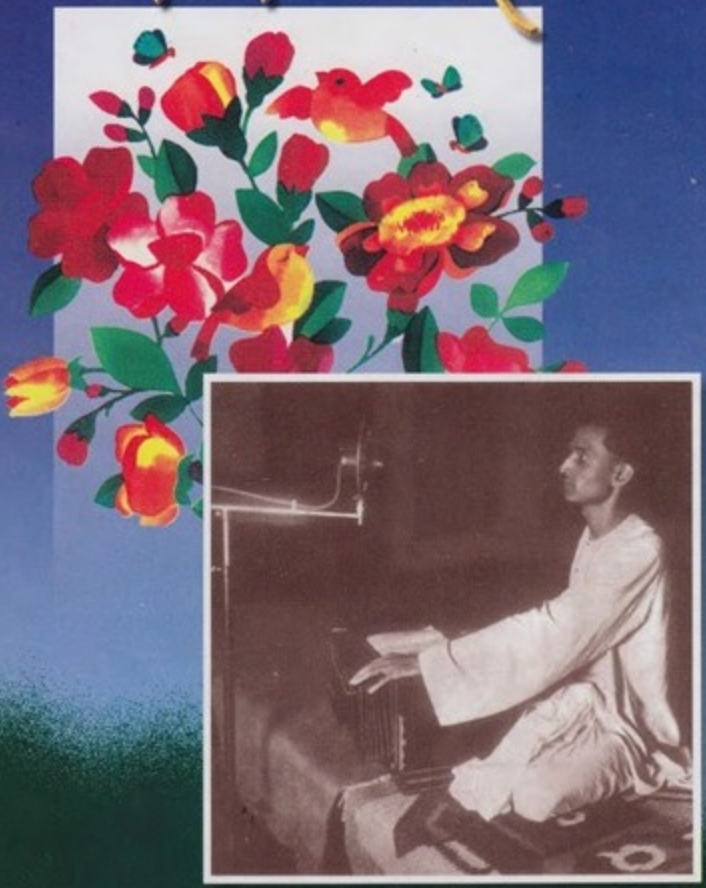

জহুরুল আলম সিদ্দিকী

ছোটদের
সংগীতশিল্পী আব্বাসউদ্দীন

জহুরুল আলম সিদ্দিকী

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা।

www.pathagar.com

ছোটদের সংগীতশিল্পী আব্বাসউদ্দীন

জহুরুল আলম সিদ্দিকী

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

প্রথম মুদ্রণঃ ফেব্রুয়ারী ২০০১

দ্বিতীয় মুদ্রণঃ জুন ২০১২

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ

আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১৬৩৮৮৫

CHOTTODER SHANGITSHILPI ABBASUDDIN Written by **Zahurul Alam Siddiqui**, , Published by S.M. Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. Niaz Mangil, 922 Jubilee Road, Chittagong and 125, Motijheel Commercial Area, Motijheel, Dhaka-1000 First Edition August 2010,

Price :150.00 Only. US$. 05.00 **ISBN-984-493-062-6**

www.pathagar.com

উৎসর্গ,

বিশিষ্ট ব্যাংকার ও সাহিত্যামোদী

জনাব এইচ, কে, এম, আলতাফ হোসেন

শ্রদ্ধাভাজনেষু

www.pathagar.com

ভূমিকা

বাংলাদেশের সংগীতের ইতিহাসে আব্বাসউদ্দীন এক অবিস্মরণীয় নাম। আব্বাসউদ্দীন যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন তখন মুসলমানদের গান শোনা ছিল না জায়েজ কাজ। আর গান গাওয়া ? সে ছিল চরম গর্হিত বিষয়। মুসলিম পরিবারের ছেলেদের কণ্ঠ সাধনার সুযোগ ছিল না বিন্দুমাত্র। কিন্তু যুগটা ছিল মুসলিম রেঁনেসার যুগ। সাহিত্যে, খেলাধূলায়, রাজনীতিতে মুসলমানদের দুর্দান্ত আগমণ ঘটলেও সংগীতের মাধ্যমে যে নবজাগরণ আনা যায় তা ছিল একে-বারেই অকল্পনীয় ব্যাপার। আব্বাসউদ্দীন এই কঠিন কাজটিকে সহজ করে তুললেন খোদা প্রদত্ত তার সুললিত কণ্ঠ দিয়ে। সংগীতে আবুল কাসেম মল্লিক 'কে, মল্লিক'এ রূপান্তরিত হলেন। কিন্তু সংগীতে আব্বাসউদ্দীন মুসলিম নামটি অক্ষত রেখে দীপ্ত আগমণ ঘোষণা করলেন এবং এই নামেই হলেন মশহুর।

আমরা কাজী নজরুলকে নানা অভিধায় ভূষিত করি। তার এক একটি ইসলামী গান অতুলনীয় বলে স্বীকার করি। কিন্তু আমরা জানি না নজরুলের ইসলামী গানের প্রেরণাই ছিলেন আব্বাসউদ্দীন। নজরুলকে দিয়ে তিনি ইসলামী গান লিখিয়েছেন, সুর দিয়েছেন, নিজে দরদমাখা কণ্ঠ দিয়েছেন আর গ্রামোফোন কোম্পানীকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে ইসলামী গানের রেকর্ড করাবার ব্যবস্থা করেছেন। এই গান শুনিয়ে বাংলার সাধারণ মুসলমানদের ধর্মের পথে উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

আব্বাসউদ্দীন সমকালীন সময়ে একজন শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। মুসলমানদের সাংস্কৃতিক বিকাশে আব্বাসউদ্দীন পালন করেছেন এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা। আজ শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে ফজরের নামাজ পড়ে ঘরের মেয়েটি হারমোনিয়াম বাজিয়ে সুর সাধনা করছে। মুসলিম সমাজ চেতনায় এই রূপান্তরটি ঘটিয়ে গেছেন আব্বাসউদ্দীন। এর পাশাপাশি গ্রাম বাংলার লোক সংগীত, ভাটিয়ালী, মুর্শিদী, ভাওয়াইয়া গানকে শুধু বাংলাদেশেই নয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিত ঘটিয়ে গেছেন তিনি।

বাঙালী এই মহান পুরুষের জীবন ধারা সহজ ভাষায় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তুলে ধরাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আব্বাসউদ্দীন আশা করেছিলেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শ্রদ্ধার সাথে এদেশের মানুষ তাকে স্মরণ

www.pathagar.com

করবে। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। সুসাহিত্যিক মরহুম আনিস সিদ্দিকীর 'ছোটদের সুরশিল্পী আব্বাসউদ্দীন' গ্রন্থ ছাড়া আর কেউ তার পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। সেই অভাব পূরনের জন্য আমার এই উদ্যোগ। এই ধরনের বই লেখার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস হলো 'আত্ম জীবনী'। আব্বাসউদ্দীনও লিখে গেছেন তার স্মৃতিকথা 'আমার শিল্পী জীবনের কথা'। তাই স্বাভাবতই আমাকে বহু উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' গ্রন্থ হতে। বইটি লেখার জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন বন্ধুবর বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মোঃ মোখলেছুর রহমান মিন্টু। পান্ডুলিপি সংশোধন করে দিয়েছেন আব্বাসউদ্দীনের সুযোগ্য পুত্র জনাব মোস্তফা জামান আব্বাসী। তাদের উভয়কে কৃতজ্ঞতা জানাই। শিশু-কিশোরদের জীবন গঠনে বইটি সহায়তা করবে এবং বড়রা বইটি পড়ে নতুনভাবে আব্বাসউদ্দীনকে উপলব্ধি করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

জহরুল আলম সিদ্দিকী

৩৬/১সি, শাহআলীবাগ
মিরপুর, ঢাকা।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আব্বাসউদ্দীনকে বলা হয় গানের ভুবনে বাংলার বুলবুল। তিনি শুধু একজন সংগীতশিল্পী ছিলেন না, ছিলেন বাঙালি মুসলিম সমাজের অনন্য রূপকার, অতুলনীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। এখনকার দিনে একজন গায়ক যতো সহজে ঘরে ঘরে পৌছে দিতে পারছেন তার কণ্ঠকে আব্বাসউদ্দীনের যুগে সেটা ছিল এক অকল্পনীয় ব্যাপার। গ্রাম থেকে আগত একজন শিল্পী তাও মুসলিম পরিবারের—কোলকাতায় এলেন। হাজারো সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে গানের ভুবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেন। এসবের মূলে কাজ করেছে তাঁর অপরিসীম ধর্মীয় চেতনাবোধ। রক্ষণশীল বাঙালি মুসলমানদের সংগীত-মনস্ক করার বিশাল দায়িত্বটি যেন একাই তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশে তাই তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

ব্যক্তিগত জীবনে আব্বাসউদ্দীন ছিলেন সহজ সরল গভীর রুচিবান। তাঁর কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত। গান নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তাই তাঁর ব্যক্তি জীবনের মতো অসাধারণ সৌন্দর্যবোধের পরিচয় মেলে। তিনি যখন পল্লী গান গেয়েছেন, সুরে এবং স্বরে ঝরে পড়েছে পল্লী মায়ের মমতা। আল্লাহ রাসুলের গান যখন করেছেন, সুরে ঝরে পড়েছে একান্ত বিশ্বাসী নিবেদিত প্রাণ একজন মুসলিমের হৃদয়ের আকুলতা। আবার এই আব্বাসউদ্দীন যখন উদ্দীপনামূলক কওমী গান গেয়েছেন, তখন তিনি একজন সিংহপুরুষ, বলিষ্ঠ কণ্ঠের সুরশিল্পী।

সংগীত জীবনের প্রারম্ভে কাজী নজরুল ইসলাম আধুনিক গান আর কীর্তন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আব্বাসউদ্দীন একজন দরদী মুসলমান হিসেবে তাঁকে ইসলামী গান লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। তারপর উদ্দীপনামূলক কওমী গানও লিখিয়েছেন কবিকে দিয়ে। নজরুল গান বেঁধেছেন, সুর সেধেছেন আব্বাসউদ্দীন। এই গান শুনে বাংলার মুসলমানরা তাদের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্য চেতনায় জাগ্রত হয়েছে, পরাধীন ভারতবর্ষে তাদের অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছে। মুসলিম রাজনীতিবিদদের পক্ষেও সহজ হয়েছে জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার কথাটা তুলে ধরতে। আর এই সবের সম্মিলিত প্রয়াসে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের মুসলমানরা তাদের জন্য স্বতন্ত্র একটা আবাসভূমি গড়ার কাজে সম্মিলিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছে। রাজনীতিবিদদের নামের সাথে সাথে নজরুল এবং আব্বাসউদ্দীনএর নামও তাই স্থান করে নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ সুদীর্ঘ ৬৪ বছর ধরে বাঙালি জাতির আত্মানুসন্ধানের কাজে অবদান রেখে আসছে। তারই ধারাবাহিকতা এবং জাতির সুস্থ মন-মানসিকতা বিকাশে শিশু-কিশোর উপযোগী করে এবারে আমরা প্রকাশ করছি আব্বাসউদ্দীনের জীবনী গ্রন্থ ছোটদের সংগীতশিল্প আব্বাসউদ্দীন। পাঠক সমাজে বইটি সমাদৃত হলে আমাদের আয়োজন সার্থক মনে করবো।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

এক

বড়ভাই টেলিগ্রাম করেছেন; বাড়ি আসতে হবে। পিতা মৃত্যুশয্যায়। আব্বাসকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। বার বার খোঁজ নিচ্ছেন, আব্বাস এলো কিনা।

বি.এ পরীক্ষা শেষ হয়েছে। হাতে অফুরন্ত সময়। বন্ধু আবুল হোসেনের প্রস্তাবে তার সাথেই আব্বাস বেড়াতে গিয়েছেন রংপুরের এক গন্ডগ্রাম-বড়খাতায়। সেখানে পাখি শিকার করে, ফুটবল খেলে, গ্রামের ছেলেদের সাথে গান গেয়ে কেটে গেছে প্রায় পনেরো দিন। এমনি সময়ে বড় ভাইয়ের টেলিগ্রাম।

আব্বাস অপেক্ষা করলেন না এক মুহূর্ত। বন্ধুর বাড়ির লোকজনের নিকট হতে কোনরকম বিদায় নিয়ে উদভ্রান্তের মতো বের হয়ে পড়লেন। তার নিজ বাড়ি কুচবিহারের বলরামপুর পৌঁছতে গভীর রাত হয়ে গেলো।

উৎকণ্ঠার সাথে আব্বাস ঢুকলেন পিতার ঘরে। অতুজ্জ্বল একটা রাতি ঘরের অন্ধকার তাড়াবার কাজে ব্যস্ত। বড়ভাই বসে আছেন বাবার শিয়রে। একটু আগে বাবা ঘুমিয়ে পড়েছেন। শব্দ পেয়ে চোখ মেললেন তিনি। আব্বাসকে দেখে মুখমন্ডল তার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ইশারায় কাছে ডাকলেন।

—এতো দেরি করে এলে, বাবা ?

—বন্ধুর বাড়ি অজ পাড়াগাঁয়ে। টেলিগ্রাম পৌঁছতে বিলম্ব হয়েছে।

—বি, এ পরীক্ষা কেমন হয়েছে, বাবা ?

—খুব ভালো হয়েছে। পাশ করবো ইনশাল্লাহ।

—আমিও তাই চাই। বি, এ পাশ তোমাকে করতেই হবে। ব্যারিস্টার হতে হবে। সারা জীবন এই স্বপ্ন দেখে এসেছি আমি।

ইতোমধ্যে অন্যান্যরা জেগে উঠেছেন। আব্বাসকে দেখে আম্মাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ছেলেকে শেষ দেখার সান্ত্বনা নিয়ে পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারবেন বাবা।

তারপর তিন চার দিন অবস্থা খুবই খারাপ গেলো। নিঃশ্বাস এই আসে, এই যায়। সোমবার রাত চারটার দিকে পিতার অবস্থার আরো অবনতি হলো। ঠান্ডা হয়ে এলো হাত-পা। শুধু ধীরে ধীরে বইছে নিশ্বাসটুকু। সবাই কান্নাকাটি করতে লাগলেন। এবার বুঝি নিভে যাবে জীবন প্রদীপ।

হঠাৎ করে আব্বাসের মনে পড়লো সম্রাট বাবরের কথা। পুত্র হুমায়ুন মৃত্যুশয্যায়। স্নেহের নিধিকে আগামী দিনের সম্রাট হিসেবেই তিনি গড়ে তুলেছেন। সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্য অত্যন্ত দক্ষ ও বিচক্ষণতার সাথে সম্রাট

www.pathagar.com

বাবর পরিচালনা করে এখন জীবন-সায়াহ্নে উপনীত। এই সময়ে ছেলের মৃত্যু মানেই মোগল সাম্রাজ্যের যবনিকা পতন।

গভীর রাতে পুত-পবিত্র হয়ে সম্রাট বাবর নফল নামাজ আদায় করলেন। তারপর ধরলেন মোনাজাত। নিজের জীবনের বিনিময়ে পুত্রের প্রাণভিক্ষা চাইলেন আল্লাহর দরগাহে।

আল্লাহ যেন মঞ্জুর করলেন বাদশার আর্জি। ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন হুমায়ুন। আর কিছুদিনের মধ্যে ইন্তেকাল করলেন সম্রাট বাবর।

ইতিহাসে দৃষ্টান্ত যখন আছে, আব্বাস কেন চেষ্টা করবেন না ? বয়স হবার সাথে সাথে নামাজে জেনেশুনে ফাঁকি দেননি কখনো। সকালে কোরআন পাঠ না করে কোন কাজ তিনি শুরু করেন না।

ঘর থেকে বের হলেন আব্বাস। অন্যান্যরা ভাবলেন, বাবার মৃত্যুকষ্ট সহ্য করতে পারছেন না ছেলে। তাই বাইরে গেলেন। কিন্তু আব্বাস গেলেন পুকুর ঘাটে। ওজু করলেন গভীর শ্রদ্ধার সাথে। তারপর এলেন তাদের দহলিজ ঘরে। একটা জায়নামাজ নিয়ে আদায় করলেন নফল নামাজ। সুরা ইয়াছিনের মুখস্ত অংশটুকু পাঠ করলেন গভীর শ্রদ্ধার সাথে। তারপর ধরলেন মোনাজাত—

"হে আল্লাহ, রহমানুর রাহীম। তুমি অন্তর্যামী। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই পিতার মুখে শুনে এসেছি সত্যিকার মানুষ হতে হলে বি, এ পাশ করা চাই। এই বি, এ পাশের জন্য মালিক ছুটে চলেছি। তুমি সর্বশক্তিমান। তোমার অসাধ্য কিছু নেই। তোমার বিনা হুকুমে গাছের একটি পাতাও নড়ে না। হুমায়ুনকে তুমি ফিরিয়ে দিয়েছিলে পিতার জীবনের বিনিময়ে। হায় খোদা, আমার সারা জীবনের আকাঙ্খা ওই বি, এ পাশটা তুমি আমার ভাগ্য থেকে ছিনিয়ে নাও। তার বিনিময়ে সুস্থ করে দাও আমার পিতাকে। তুমি অনন্ত জগতের অধিশ্বর। তুমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনাটুকু কবুল করো মালিক।"

কতক্ষণ যে আব্বাস জায়নামাজে পড়েছিলেন খেয়াল নেই। আল্লাহর দরগাহে কান্নাকাটি করে বুকটা যখন একটু হালকা হলো দেখলেন, পূর্ব দিক ফর্সা হয়ে এসেছে। আব্বার ঘরের দিকের কান্নাকাটিও থেমে গেছে। চারদিক ভীষণ রকমের স্তব্ধতা। আব্বাস ভাবলেন, ইতিমধ্যে সব শেষ।

ভয়ে ভয়ে আব্বাস ঢুকলেন পিতার ঘরে। আনন্দে ভরে উঠলো তার মন। পিতা নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে। আব্বাসকে দেখে কাছে ডাকলেন।

গায়ে হাত দিয়ে আব্বাস দেখলেন, স্বাভাবিক তাপমাত্রা ফিরে এসেছে পিতার। অস্থিরতাও কমে গেছে।

www.pathagar.com

—ফজরের নামাজ কি পড়লে বাবা ? পিতা জিজ্ঞাসা করলেন আব্বাসকে। তার প্রথম তাগাদাই নামাজের প্রতি।

—হ্যাঁ, বাবা।

—একটা দুঃসহ ভারী পাথর যেন এতোদিন আমার বুকের উপর চেপে বসেছিল। আজ ফজরের সময় কে যেন সেটা সরিয়ে নিলো। সেই থেকে খুব হালকা বোধ হচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে, শরীরের কোথাও আর কোনো অসুখ নেই।

আনন্দে আব্বাসের দু'চোখে পানি এলো। তড়িঘড়ি করে তিনি ঘর থেকে বের হলেন। আবার ওজু করলেন। দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর দরগাহে হাজার শুকরিয়া আদায় করলেন। বললেন,—এআল্লাহ, তুমি আমার দোওয়া কবুল করেছো। তাতেই আমি খুশি। দরকার নেই আমার বি, এ পাশের। ওই দু'টি অক্ষরের বিনিময়ে তুমি আমার পিতাকে শত বছরের হায়াত দাও।

আল্লাহ তার এই মোনাজাতও কবুল করেছিলেন। শতায়ু পেয়েছিলেন তিনি। ১১৫ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন।

আর আব্বাসউদ্দীন ? বি.এ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলো। কলেজের সেরা ছাত্রটির নাম গেজেটে উঠলো না। এই অপ্রত্যাশিত ফলাফলে কলেজের শিক্ষকগণ অবাক হলেন। কিন্তু আব্বাসউদ্দীন বিচলিত হলেন না এতোটুকু। আল্লাহর উপর তার বিশ্বাস আরো অটুট হলো। তার মোটেই আক্ষেপ নেই দেখে অবাক হলো সহপাঠীরা। আব্বাস তাদের বললেন,—আমি আগেই জানতাম, পাশ আমি করবো না। গেজেটে নাম উঠলে বরং আমি অবাক হতাম। এর চেয়ে বেশি আর জানতে চেয়ো না আমার কাছে।

এতোক্ষণ তোমরা একজন পিতৃভক্ত আব্বাস এর কথা জানতে পারলে। নিশ্চয় তোমাদের জানতে ইচ্ছে করছে কে এই আব্বাস উদ্দীন ? কি তার পরিচয় ?

এই আব্বাসউদ্দীন হলেন বাংলার এক সময়ের সাড়া জাগানো সুরশিল্পী। কণ্ঠ ছিল তার কোকিলের মতোই সুমিষ্ট। ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত বাংলায় আব্বাসের নাম শোনেনি এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। তখনকার দিনে রেডিও-ট্রানজিস্টরের প্রচলন খুব একটা ছিল না। উচ্চবিত্তদের ঘরে ছিল 'কলের গান'। এই কলের গানের মাধ্যমেই আব্বাসের কণ্ঠ পৌঁছে গিয়েছিল বাংলার ঘরে ঘরে। মন্ত্রী-রাজনীতিবিদদের সভা সমিতিতে আব্বাসউদ্দীন উপস্থিত না থাকলে সে সভায় লোক হতো না। মন্ত্রীদের বক্তৃতা কেউ শুনতে আসতো না। আব্বাস

www.pathagar.com

হাজির হবেন শুনলে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসতো সভা শুনতে। তাই বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকসহ অন্যান্য মন্ত্রীরাও আব্বাসউদ্দীনকে সাথে নিতেন গ্রামে গঞ্জে সভা করার সময়। আব্বাস তার সুরেলা কণ্ঠে নজরুলের ইসলামী গান, গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষের ভাটিয়ালী ও ভাওয়াইয়া গান শুনিয়ে শ্রোতাদের করতেন মুগ্ধ। মন্ত্রীরা নাম করেন তাদের পদ-মর্যাদায়। সাহিত্যিকগণ নাম করেন তাদের লেখনীতে। কিন্তু গান গেয়ে বাংলার মানুষের অন্তরে আপন জন হিসেবে ঠাঁই করে নিতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র আব্বাসউদ্দীন। শুধু গান গেয়ে এমন সুবিশাল জনপ্রিয়তা আর কোনো শিল্পীর ভাগ্যে জুটেনি। তিনি যেমন ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক তেমনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। তার সন্তানরাও আজ দেশ-বিদেশে বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। প্রথম সন্তান মোস্তফা কামাল কিছুদিন পূর্বেও ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি। অন্য পুত্র মোস্তফা জামান আব্বাসী এবং কন্যা ফেরদৌসি রহমান দেশের বরেণ্য সংগীত শিল্পী।

অবিভক্ত বাংলার এই বরেণ্য সংগীত শিল্পী আব্বাসউদ্দীনের পরিচয় জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে এক শতাব্দী পূর্বে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে।

১৯০১ সালের ২৭শে অক্টোবর বর্তমান পশ্চিম বাংলার কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুর গ্রামে আব্বাসউদ্দীন জন্ম গ্রহণ করেন। আকিকা দিয়ে পিতা জাফর আলী আহম্মদ পুত্রের নাম রাখলেন শেখ আব্বাসউদ্দীন আহমেদ। পিতা মহকুমা শহরের সম্ভ্রান্ত আইনজীবী এবং বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। মা হিরামন নেসার দয়ার শরীর। পিতা পঁচিশ ত্রিশখানা হালের গরু, দেড়শো বিঘা খাস আবাদী জমি আর পাঁচ হাজার বিঘা প্রজা পত্তনী জমির মালিক। এই রকম অবস্থাসম্পন্ন ঘরের ছেলে হয়েও আব্বাস মোটেই কিন্তু আরাম-আয়েশের জীবন যাপন করার সুযোগ পাননি। পোশাক বলতে দুইটা ধুতি আর একটা শার্ট। পায়ে জুতা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। এমনই ছিল তার ছোটবেলা।

বলরামপুর স্কুলে ভর্তি করানো হলো আব্বাসউদ্দীনকে। নতুন একটা জগৎ এসে ধরা দিলো তার হাতে। অনেক বন্ধু পেলেন। মনের কথা বলার সুযোগ এলো তার।

স্কুলের পাশে একটা বড় পুকুর। দশটায় স্কুল বসে। অতি উৎসাহে আব্বাস ন'টার আগেই বেরিয়ে পড়েন বাড়ি থেকে। বই-পত্তর রেখে সবে মাদুরে বসেছেন, সহপাঠীদের একজন বললো,–চল যাই, পুকুরে গোসল করে আসি।

–ধুতি ভিজালে স্কুলে বসবো কি করে ? জিজ্ঞাসা করলেন আব্বাস।

www.pathagar.com

—ভিজাতে যাবো কেন ? ধুতি পাড়ে খুলে রেখে নেমে পড়বো।

—পন্ডিতমশাই যদি দেখতে পান ?

—আরো ঘন্টা খানেকের আগে তিনি আর এদিকে আসবেন না। এই একটু আগে তিনি হাল-গরু নিয়ে মাঠে গেছেন।

বন্ধুদের দেখাদেখি আব্বাসও ধুতি জামা খুলে রেখে দিগম্বর হয়ে লাফিয়ে পড়লেন পুকুরে। আহ্ কি আনন্দ। শাসন করার কেউ নেই। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে। তবু উঠবার নাম নেই। চাষ শেষে পন্ডিতমশাই আসছেন দেখে ছেলেরা পুকুর থেকে উঠে এলো। ধুতি জামা পরে শান্ত ছেলের মতো যেয়ে বসলো ক্লাসে। যেন কিছুই জানে না তারা।

কিছুদিন ধরে পন্ডিতমশাই লক্ষ্য করছেন, তার পড়ুয়াদের চোখ লাল। মাথার চুলও এলোমেলো। ক্লাসের পড়া ঠিকমতো দিতে পারছে না। ঘুমে নেতিয়ে পড়তে চায়।

পন্ডিতমশাই বুঝলেন, কোথাও একটা গোন্ডগোল আছে। একদিন তিনি আর মাঠে গেলেন না। স্কুল বসার আগে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন স্কুলের আড়ালে। আব্বাস আর তার বন্ধুরা জানতে পারলো না ব্যাপারটা। পাড়ে কাপড়-চোপড় রেখে যথারীতি নেমে পড়লেন তারা পুকুরে।

পন্ডিতমশাই ধরতে পারলেন ছেলেদের চোখ লাল থাকার কারণ। পুকুরের পাড়ে রাখা ধুতি জামাগুলো সংগ্রহ করে একসাথে বাঁধলেন তিনি। এবার ডাকলেন তার পড়ুয়াদের।

পুকুরের পাড়ে অপ্রত্যাশিতভাবে পন্ডিতমশাইকে দেখে পড়ুয়ারা গেলো হতবাক হয়ে। শুক্‌না মুখে উঠে এলো তারা পুকুর থেকে। ধুতি পরতে যেয়ে তা আর পায় না। সেগুলো আগেই পন্ডিতমশাইয়ের বোগলে চড়েছে। দিগম্বর ছেলেগুলোকে পন্ডিতমশাই লাইনে দাঁড় করালেন। ছেলেদের এই বিব্রতকর অবস্থা দেখে আশ-পাশের বাড়ির বধূদের হাসি চেপে রাখা কষ্ট হলো। ছেলেদের হজম করতে হলো দু'দুটো করে বেতের বাড়ি। এরপর ফিরে পেলো তারা ধুতি জামা।

গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কালজানি নদী। বর্ষায় এই নদী অপরূপ শোভা ধারণ করে। নদীর ভরা রূপ দেখে আব্বাসউদ্দীন উদাস হয়ে পড়েন। সুযোগ পেলেই যেয়ে বসেন নদীর পাড়ে। ভাবেন, কোথা থেকে আসছে এতো পানি। কে যোগান দিচ্ছেন এই অফুরন্ত জলরাশি। নদীর কুলকুল শব্দ তার অবচেতন মনে সুরের ব্যঞ্জনা তোলে। জোরে যখন বৃষ্টি পড়ে তাদের টিনের চালের উপর তখন আরেক সুরের মূর্ছনা। ঝমঝম শব্দ তার মনকে করে তোলে

www.pathagar.com

উন্মনা। বসন্তকালে খুব ভোরে কোকিল ডাকে। আব্বাস আর শুয়ে থাকতে পারেন না। চলে যান গাছতলায়। কান পেতে শুনতে থাকেন কোকিলের একটানা সুর। কোকিলের সাথে তিনিও কণ্ঠ মেলান। কিন্তু না, হয় না ঠিক কোকিলের মতো। কণ্ঠে এতো সুর তোলা কোকিল শিখলো কোথা থেকে ? দূরে ডাকে ঘুঘু পাখি। তার কণ্ঠেও মিষ্টি মধুর ছন্দ। শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে পড়েন বালক আব্বাস। বৌ কথা কও পাখির ডাক যেন আরো একটু চড়া। সে যেন উচ্চগ্রামে সুর তুলতেই পছন্দ করে। আব্বাস ভাবেন আর ভাবেন। কোকিল, ঘুঘু আর বৌ কথা কও পাখির গলায় সুরের ব্যঞ্জনা তাকে আকুল করে তোলে। কি করলে এদের মতো করে গলায় সুর তুলতে পারবেন তিনি ? সুর তুলে সাড়া জাগাতে পারবেন অন্যের প্রাণে। আবদ্ধ করতে পারবেন মানুষকে সুরের বন্ধনে।

হঠাৎ হঠাৎ নদীর পাড়ে যেয়ে বসা, বৃষ্টির শব্দের উৎসস্থল খোঁজার জন্য বৃষ্টিতে ভেজা, কখনো ভোরের ঠান্ডা বাতাস গায়ে লাগানো সহ্য হবে কেন ? জ্বর এলো তার। একেবারে ম্যালেরিয়া। মা তাকে বকা দেন। উৎকণ্ঠার সাথে ডি গুপ্তের টনিক খাওয়ান।

—আর কতোদিন শুয়ে থাকবো মা ?

—টনিক শেষ হবে তারপর পারবে উঠতে।

—ইস্ ঔষধ শেষ হতে অনেক দেরি। দেখনা, সবাই মাছ ধরতে যাচ্ছে। আর আমি শুয়ে আছি বিছানায়।

—এ দোষ তোমার। খুবই অনিয়ম করেছো। সুস্থ হলে আবার মাছ ধরতে পারবে। পাখির ডাক শোনার জন্য যেতে পারবে বাইরে। সান্ত্বনা দেন মা ছেলেকে।

—আচ্ছা মা, ঔষধটা একটু বেশি করে দেওয়া যায় না ? তা হলে ওটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়। আমিও তাড়াতাড়ি খেলতে যেতে পারি।

ছেলের বুদ্ধি শুনে মা হাসেন। বলেন,—একসাথে এক দাগের বেশি ঔষধ খেলে কি আর জ্বর ছাড়ে ? এটা নিয়মিত খেলে তবে জ্বর যাবে।

গরমের দিন আরো মজার। ঘরে আর বন্দী থাকতে হয় না রাতে। কাছারী ঘরের বারান্দায় বেঞ্চ পেতে শোয়া যায়। উপরে দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ। কখনো একটা দুটো তারা দৌড় দিয়ে ছুটে পালায় অন্য প্রান্তে। আব্বাস ভাবেন, তিনি যদি ওমনি করে ছুটে যেতে পারতেন এক দেশ থেকে আরেক দেশে। মাথার উপর নীল আকাশে ডানা মেলে চিল উড়ে। তার যদি পাখা থাকতো, কি মজাই না হতো। এই ছোট্ট গ্রামটি কোন মতেই তাকে ধরে রাখতে পারতো না।

www.pathagar.com

মায়ের কাছে রাতে ঘুমাবার সময়ও সহজে তার ঘুম আসে না। মাকে বলেন ঘুম পাড়ানির গান শোনাতে। মা আর কতোক্ষণ রইবেন আব্বাসের কাছে ? সংসারে তার তো আরো অনেক কাজ এখনো বাকি। মা চলে গেলে আব্বাস বাইরে কান পাতেন। ঝি ঝি পোকার একটানা ডাকটা তার কাছে মধুর মনে হয়। একটুও ক্লান্তি নেই। সুরের কোনো ছন্দপতন নেই। মনে হয় ঝি ঝি পোকার গানটা রাতের গান, ঘুম পাড়ানির গান।

শীতের ভোরে আজানের আগেই ঘুম ভেঙ্গে যায় আব্বাসউদ্দীনের। এক বাড়িতে একটা মোরগ ডাকে। তার ডাক শুনে পাশের বাড়ির মোরগটাও সাড়া দেয়। পর পর একের পর এক মোরগের কণ্ঠ ভেসে আসে। সব মোরগের কণ্ঠে যেন একই সুর, একই ছন্দ। এই সুর তারা রপ্ত করলো কিভাবে ? দূরে কে যেন শিঙা ফুঁ দেয়। তার সুরও অন্য রকম। মাকে আব্বাস জিজ্ঞাসা করেন,–এতো ভোরে ওরা কি বাজায় মা ? বেশ করুণ সুর।

—আহ্ ঘুমাও বাবা। আজ হয়তো নদীতে মাছ ধরতে যাবে গ্রামের লোকেরা। শিঙা বাজিয়ে ডাকছে তাই সবাইকে।

—আমিও মাছ ধরতে যাবো মা।

—আহ্ বিরক্ত করো না। এখনো অনেক রাত। বড় হলে তবে যেতে পারবে মাছ ধরতে।

ডেকে ওঠে একটা শিয়াল। তারপর দূরে আরেকটা। হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া। খানিক পরে অনেকগুলো শিয়াল একসাথে ডেকে ওঠে। আব্বাস জড়িয়ে ধরেন মাকে। শিয়ালের এই সুর মোটেই তার পছন্দ নয়। সুর যে মানুষকে ভয়ও পাইয়ে দেয়- তাও জানতে পারেন তিনি। তার মনে হয়, এই গ্রামে শুধু শিয়ালই থাকে। যাত্রাদলের ছেলেদের মতো কোরাস গানে গলা সাধে তারা।

আষাঢ় মাসে তাদের বাড়ির সামনের পুকুরটা পানিতে টইটুম্বুর। পুকুরের পাড়ে নিচু জমিগুলো পানিতে থৈ থৈ। পাশে বাঁশ ঝাড়। ভোরবেলা আব্বাস আম কুড়াতে যান পুকুরের পাড়ে। দেখতে পান, পুকুর পাড়ে বসে আছে ইয়া বড় বড় এক একটা ব্যাঙ। সারা গায়ে হলুদ মেখেছে। মিষ্টি গলায় তারাও জুড়ে দিয়েছে সংগীত। একটানা ঘ্যাকোঙ ঘ্যাক। আম কুড়ানো আর হয় না। নির্নিমেষ নয়নে আব্বাস তাকিয়ে থাকেন ব্যাঙগুলোর দিকে। এগুলো তার কাছে আর ব্যাঙ বলে মনে হয় না। মনে হয় এক একটা হলদে পরীর বাচ্চা বসে বসে সুর তুলছে বীণায়।

এই সময়ে একটা ঘটনা শিশু আব্বাসের মনে দারুণ সাড়া জাগালো। 'পাগারু' নামে একজন বৃদ্ধ লোক এলেন তাদের গ্রামে। তার হাতে একটা

www.pathagar.com

দোতারা। তাই বাজিয়ে তিনি সাহায্য চাইলেন ঘরে ঘরে। দোতারার সুর বালক আব্বাসকে নিয়ে গেলো অন্য জগতে। তার মনে হলো, ইতোপূর্বে তিনি মোরগ, শিয়াল, ঘুঘু, কোকিল ইত্যাদির ডাক শুনেছেন তাদের সব সুরটাই যেন পাগারু বৃদ্ধ বেঁধে রেখেছেন তার দোতারার তারে। কখনো সে বউ কথা কও এর মতো উচ্চগ্রামে গান ধরছে, কখনো বা কোকিলের মতো মোলায়েম সুরে। তার দোতারাটা নিজেই যেন একে একে সৃষ্টি করে চলেছে এক একটি সুর।

আব্বাস সারা দিন এই পাগারু বুড়োর পিছন পিছন ঘুরলেন। বুড়োও লক্ষ্য করছিল ব্যাপারটা। আব্বাসকে ডেকে সে বললো, তুমি গান পছন্দ করো, বাবা?

—খুব পছন্দ করি। এতো সুর তুমি শিখলে কি করে ?

—এটা দীর্ঘ দিনের সাধনা, বাবা। সাধনা করলে তুমিও একজন শিল্পী হতে পারবে। শুধু গলা ভালো হলে চলবে না, তার সাথে যন্ত্রেরও সমন্বয় চাই।

—কোথায় পাবো যন্ত্র ? আব্বাসের আর তর সয় না।

—ঘোড়ার লেজ দিয়ে এক রকম বেহালা তৈরি করা যায়। কিভাবে বেহালা তৈরি করা যাবে তার কৌশল শিখিয়ে দিলো পাগারু বুড়ো আব্বাসউদ্দীনকে।

গ্রামে অনেক ঘোড়া আছে। আব্বাস ধরলেন তার চেয়ে একটু বয়সে বড় ছেলেদের। কয়েকটা ঘোড়ার লেজ সংগ্রহ করে দিতে হবে। ছেলেরাও অতি উৎসাহে লেগে গেলো ঘোড়া ধরার কাজে। একটা ঘোড়া পাকড়াও করা হলো। কিন্তু বিপদ ঘটলো অন্যখানে। লেজের চুল জোরে টান দিতেই ঘোড়া দিলো লাথি। লাথি খেয়ে একটা ছেলে পড়লো অজ্ঞান হয়ে। খবর শুনে বাবা আব্বাসকে কান ধরে নিয়ে এলেন বাড়িতে। বাবার এই কান টানা আব্বাসের কিন্তু খারাপ লাগেনি একটুও। ঘোড়ার লেজ দিয়ে একটা বেহালা তিনি শেষ পর্যন্ত বানিয়ে ফেললেন। এই বেহালা বাজিয়ে পাগারু বুড়োর মতো গান গাওয়াও শুরু করলেন। বাবার রাগ পড়ে এলো। ছেলের কান্ড দেখে বললেন,–তুই কি শুধু গান বাজনাই করবি ? পড়াশুনা করবি নে ?

আব্বাস যে শুধু গান বাজনা নিয়েই মেতে রইলেন তা নয়। ক্লাসে বরাবরই তিনি প্রথম হন। পড়াশুনায়, আচার-আচরণে স্কুলের সেরা ছাত্র তিনি।

ফুলের প্রতি আব্বাসের রয়েছে অসাধারণ ভালোবাসা। ফুল দেখলেই তার মন আনচান করে। ফুল উঠিয়ে নিজের কাছে রাখতে ভালো লাগে। ফুলের সুবাস পাগল করে তোলে তার মন।

বাড়ির পাশেই সরকারী ডাকবাংলো। সরকারী কর্মকর্তারা এলে থাকেন সেখানে। এই বাংলোর শোভা বর্ধনে ফুল চাষের জন্য একজন মালী রয়েছে। বহু

www.pathagar.com

যা বলছিলাম। সুরের জগতে ঢুকে আব্বাস আর থেমে রইলেন না। গ্রামের চাষী ধান কাটার সময় যে গান গায় আব্বাস তার সুর উঠিয়ে নেন কণ্ঠে। মাঝি নৌকা চালায়। তার কণ্ঠেও সুর। এই সুরও রপ্ত করে ফেলেন তিনি। গ্রামের আধিয়ারী প্রজারা পাট নিড়াতে নিড়াতে ভাওয়াইয়া গান গায়। এগানও আব্বাসকে আকৃষ্ট করে। শিখে ফেলেন তাও।

বাড়ি থেকে স্কুল খুব বেশি দূরে নয়। বাড়িতে গলা ছেড়ে গান গাওয়া যায় না। পথে উঠেই তিনি গান ধরেন। কিছুদূর গেলে বেশ কয়েকটি দোকান। সেখানে সব সময় লোক থাকে বলে গান গাওয়া যায় না।

স্কুলে যাওয়ার পথে একদিন আব্বাস সবে গান ধরেছেন। গঞ্জ থেকে তার বাবা ফিরছিলেন বাড়িতে। আব্বাস দেখেননি তাকে। পড়ে গেলেন একেবারে সামনা-সামনি। আব্বাস ভাবলেন, আজ আর রক্ষা নেই। ধরা পড়েছেন হাতে হাতে।

বাবা কিন্তু কিছুই বললেন না। সস্নেহে ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন। একটা চুমু দিয়ে বললেন,–ভাত খেয়ে এসেছো, বাবা ?

—হ্যাঁ, খেয়েছি। কোনো রকমে উত্তর দিলেন আব্বাসউদ্দীন।

—তা হলে স্কুলে যাও। খুব মন দিয়ে পড়বে। ক্লাসের প্রথম স্থানটা যেন কেউ নিতে না পারে।

ঘটনা সামান্য কিন্তু এটাই মোড় ঘুরিয়ে দিলো আব্বাসের জীবনের। এতোদিন তিনি শুনে এসেছেন মুসলমান ছেলেদের গান গাইতে নেই। তাতে পাপ হয়। আজ পিতার যে সস্নেহ প্রশ্রয় পেলেন তাতে সাহসী হয়ে উঠলেন তিনি। এখন আর লুকিয়ে লুকিয়ে নদীর ধারে যেয়ে গান গাওয়া নয়, ঘরের মধ্যেই সাধনা করা যাবে। পিতার এই আদরটুকু, প্রশ্রয়টুকু সারা জীবন তিনি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছেন।

আব্বাসের গ্রামের দুইজন যুবক যাত্রা দল খুললেন। দলের জন্য কুচবিহার শহর থেকে একজন সংগীত শিক্ষক নিয়ে আসা হলো। বেশ নাম করলো যাত্রা দলটি। আব্বাস মায়ের অনুমতি নিয়ে একদিন গেলেন যাত্রা দেখতে। কুচবিহার থেকে আগত সংগীত শিক্ষকের গান ভারি ভালো লাগলো তার। ভাবলেন, এই রকম গলা ছেড়ে গান গাইতে কবে পারবেন তিনি।

পরদিন আব্বাস ঘুরঘুর করতে লাগলেন যাত্রাদলের আশপাশে। ওই শিক্ষকের সাথে একটু কথা বলতে চান। কি ভাবে গান গাইলে লোকে ভালো বলবে তার পরামর্শ নিতে চান। সংগীত শিক্ষককে দেখে আব্বাস নমস্কার করলেন।

www.pathagar.com

—কি চাই বাবু ? খুঁজছো কাউকে ?

—আপনাকেই খুঁজছি। সলজ্জ কণ্ঠে বললেন আব্বাস।

—কেন ? বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইলেন শিক্ষক।

—আপনার গান আমার ভালো লেগেছে। কিভাবে গান করেন তা আমাকে একটু শেখাবেন ?

—তুমি গান করো নাকি ? একটা গান শোনাও তো আমাকে।

আব্বাস তার তাবুতে গেলেন। একটা ভাওয়াইয়া গান গেয়ে শোনালেন। ছোট একটা ছেলের কণ্ঠে এতো সুন্দর গান শুনে মোহিত হলেন সংগীত শিক্ষক। যাত্রাদলের ম্যানেজারকে ডেকে বললেন,—এই ছেলেটাকে যেভাবে হোক দলে নিন। একে পেলে দলের ভীষণ নাম হবে।

—আপনি চেনেন না ছেলেটিকে। ওর বাবা নামকরা উকিল। তারপর ওদের রয়েছে বিশাল ভূ-সম্পত্তি। যাত্রাদলে নাম লেখাবে কোন দুঃখে।

আব্বাসের কণ্ঠ শুনে সংগীত শিক্ষক খুব বিমোহিত হয়েছেন। তিনি গেলেন তার পিতার কাছে। প্রস্তাব করলেন ছেলেকে কিছুদিনের জন্য যাত্রাদলে দিতে। কথাটা শুনে জাফর আলী আহমদ বললেন,—গৃহে অতিথি এলে অপমান করতে নেই। তাই আপনাকে আমি কিছু বললাম না। ছেলে আমার ভবিষ্যতে কি হবে জানি না। তবে তাকে উচ্চ শিক্ষিত হতে হবে। ব্যারিস্টার হতে হবে।

গ্রামের স্কুলে পড়া শেষ হলো। আব্বাসকে ভর্তি করে দেওয়া হলো কুচবিহার শহরের একটা স্কুলে। থাকার ব্যবস্থা হলো হোস্টেলে। কিন্তু কুচবিহার এসে আব্বাসের মন টেকে না। শহরের নিরানন্দ পরিবেশ তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। দু'চার দিনের ছুটি হলেই তিনি চলে আসেন বলরামপুরে। কুচবিহার শহর তার কাছে একটা বিভীষিকার শহর বলে মনে হয়।

পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ছুটি পেয়ে আব্বাস চলে এসেছেন বাড়িতে। পড়াশুনার কোনো চাপ নেই। অপেক্ষা করেন, কখন বিকেল হবে। রোদটা একটু হেলে পড়লেই সমবয়সীদের সাথে নেমে পড়েন মাঠে। সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে খেলা।

একদিন ফুটবল খেলছেন মাঠে। একজন এসে খবর দিলো,—আব্বাস তোমাদের বাড়িতে কলের গানে গান হচ্ছে।

—কলের গান আবার কি জিনিস ?

—গেলেই দেখতে পাবে। একটা বাক্স। তার মধ্য থেকে গান বের হচ্ছে।

গানের কথা শুনে এক দৌড়ে আব্বাস চলে এলেন বাড়িতে। দেখলেন, সত্যি একটা বাক্সের মধ্য থেকে গান বের হচ্ছে। গানের সাথে আবার বাজনাও।

www.pathagar.com

যত্ন করে নানা ধরণের ফুল ফোটায় সে তার বাগানে। বারো মাস ফুল ফোটে সেখানে।

আব্বাস প্রলুব্ধ হলেন নানা রকম বাহারী ফুল দেখে। যখন মালী থাকে না আশপাশে, টুপ করে ঢুকে পড়েন ফুলের বাগানে। সন্তর্পণে ফুল তুলে নিয়ে আসেন বাড়িতে।

বেশ কিছুদিন চললো এভাবে মালীর সাথে লুকোচুরি। মালী ইতোমধ্যে বুঝে ফেলেছে কে যেন তার বাগানের ফুল চুরি করছে। চোর ধরতে হবে। মালী পাহারা দেয় ফুলের বাগান আর আব্বাস পাহারা দেন মালীকে।

মালী ধারে কাছে নেই ভেবে আব্বাস তড়িঘড়ি করে ফুল ছিঁড়ছেন। পিছন থেকে কে যেন খপ করে ধরে ফেললো তার হাত।

আব্বাসের পরিচয় মালী জানে। তাই বেশিদূর আর ব্যাপারটা গড়ালো না। শুধু বললো,–তুমি ফুল নিয়ে কি করো, খোকা ?

—গন্ধরাজ নিয়ে জানালার কাছে রাখি। বাতাসে সে সুগন্ধ ঘরে ঢোকে। খুব ভালো লাগে আমার। বেলী ফুল দিয়ে মালা গাঁথি। তা দেই স্কুলের স্যারকে।

—এই তোলা ফুল একদিনেই যায় শুকিয়ে। তুমি আবার আসো ফুল চুরি করতে। ফুল না তুলেও তো ফুলের সুবাস নেয়া যেতে পারে।

—কি ভাবে ? আমি কি বসে থাকবো আপনার বাগানে সারাদিন ?

—তা কেন ? তোমাকে আমি রজনীগন্ধা আর গোলাপের ডাল দিব। সেগুলো পুতে দেবে তোমার জানালার ধারে। ইচ্ছে করলে আলাদা একটা বাগানও করতে পারো। তাতে বারোমাস ফুল ফোটানোর আনন্দ পাবে তুমি।

মালীর বুদ্ধি দেখে আব্বাস অবাক হলেন। সেদিনই কয়েকটা ডাল নিয়ে এলেন মালীর নিকট হতে। কিভাবে তা লাগাতে হবে তার কৌশলও শিখিয়ে দিল মালী।

নতুন একটা কাজ পেলেন আব্বাসউদ্দীন। কোদাল যোগাড় করা হলো। হৈ চৈ করে মাটিও কোপানো হলো। লাগানো হলো মালীর দেয়া ডালগুলো। কিছু মৌসুমী ফুলের বীজও আনা হলো। পরিচর্যা চলতে লাগলো মালীর উপদেশ মতো।

কিছু দিনের মধ্যে সত্যি সত্যিই তার লাগানো গাছে ফুল ধরলো। আব্বাসের আনন্দ দেখে কে। ডেকে নিয়ে এলেন আব্বাকে। দেখালেন তার কৃতিত্ব। স্কুলের বন্ধুদেরও ঘটা করে দেখানো হলো তার বাগান।

www.pathagar.com

আব্বাসের ফুলের বাগান দেখে সহপাঠীরা উৎসাহিত হলো। বাড়ির আঙিনায় কেউ কেউ বাগানও করে ফেললো। শুরু হলো ফুল ফোটানোর প্রতিযোগিতা। কে কতো ফুল গাছ লাগাতে পারে তাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো তারা।

আব্বাস দেখলেন নিজের বাগানের ফুল তুললে ক্ষতি হয়। ফুলের সংখ্যা কমে যায়। তাই তিনি তার পুরানো অভ্যাসে ফিরে গেলেন আবার। আবারো চুরি করতে লাগলেন ডাকবাংলোর মালীর ফুল।

আব্বাস একদিন ফুল চুরির ফাঁদে পড়লেন। তাকে ফুল ছিঁড়তে দেখে মালী ধরে ফেললো। বললো,–খোকা, তোমার নিজের একটা সুন্দর বাগান হয়েছে। অনেক ফুল ফোটে সেখানে। তুমি আবার আমার ফুল ছিঁড়ে নাও কেন?

—মালীভাই, আমার বাগানের ফুল ছিঁড়তে বড় মায়া লাগে। ওদিকে স্যারেরা ফুলের মালা নিয়ে যেতে বলে স্কুলে।

—ফুল যারা ভালোবাসে তাদের মনটা চিরকাল ফুলের মতো নির্মল থাকে। কিন্তু খোকা, তোমার বাগানের ফুল ছিঁড়তে তোমার যেমন মায়া লাগে, আমার বাগানের ফুল কেউ ছিঁড়ে নিলে আমারও মায়া লাগে। তুমি না বলে ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যাও এতে আমি খুব দুঃখ পাই।

আব্বাস বুঝলেন ব্যাপারটা অন্যায় হয়েছে। তাই মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। মালী এতে খুশি হলো। আরো বেশ কয়েকটা ফুলের চারা উঠিয়ে দিল আব্বাসের হাতে। শিখিয়ে দিল তা লাগানোর কৌশল।

খুব ভোরে আব্বাস বাগান থেকে ফুল ওঠান। তার প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব তার আব্বা। বাবার শিয়রের কাছে গন্ধরাজ আর বেলীফুল রেখে আসেন। পিতাও খুশি হন ছেলেকে এইসব নির্মল কাজে ডুবে থাকতে দেখে।

একদিন পিতা তাকে নিয়ে গেলেন মহকুমা শহর তুফানগঞ্জে। তার বয়স তখন সবে আট পেরিয়েছে। শহরে এক বিরাট জনসভা চলছে। শত শত লোক কাগজে নাম দস্তখত করছে। তবে নামের সামনে 'শেখ' পদবীটা লিখছে না। পিতার কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইলেন আব্বাস।

পিতা বললেন,–এই এলাকার শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানরা নামের সামনে ইচ্ছে করে 'শেখ' লেখে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, সুন্নী মুসলমানরা 'শেখ' কথাটা বর্জন করবে। এই দরখাস্তখানা জমা দেওয়া হবে কাছারিতে। তাই দরখাস্তে সই করছে সবাই। তুমিও সই করো।

আব্বাস তাই করলেন। সেই থেকে তিনি আর 'শেখ' পদবীটা নামের সামনে বসাননি কখনো।

www.pathagar.com

ভিড় ঠেলে আব্বাস যেয়ে বসলেন কলের গানওয়ালা লোকটার কাছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কুকুরের ছবি আঁকা চোঙ্গাওয়ালা যন্ত্রটার দিকে।

—কে গান গাইছে এর ভেতরে ? লোকটার কাছে জানতে চাইলেন আব্বাস উদ্দীন।

—একজন লোক বসে গান গাইছে এর মধ্যে। তুমি কি তাকে দেখতে চাও?

—খুব দেখতে চাই। গায়ককে দেখার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না তিনি।

—তা হলে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমি গান শোনাচ্ছি। তার জন্য দেয় মাত্র একসের চাল। তুমি যদি গান গাইয়ে লোকটাকে দেখতে চাও তা হলে চার পাঁচ সের চাল নিয়ে এসো। আমি বাক্সটা খুলে দেখিয়ে দেবো।

আব্বাসের আর তর সয় না। দৌড়ে গেলেন বাড়ির ভিতরে। কিন্তু মাকে খুঁজে পেলেন না রান্না ঘরে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে মাকে পেলেন বড় ঘরের জানালার পাশে। ওপাশে কলের গানে যে গান হচ্ছে আড়ালে দাঁড়িয়ে মা তা শুনছেন মনোযোগ দিয়ে।

মাকে আব্বাস হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন। একটা ধামাতে চার পাঁচ সের চাল দিতে বললেন।

—চাল দিয়ে কি হবে ? জানতে চাইলেন মা।

—যে গান গাইছে লোকটা তা আমাকে দেখাবে বলছে। তার জন্য এই চাল দিতে হবে। তাড়াতাড়ি করো। লোকটা এর পরে হয়তো দেখাতে চাইবে না।

ছেলের কথা শুনে মাও অবাক হলেন। সত্যি কি লোকটাকে দেখা যাবে? মাত্র চার সের চাল তো। লোকটাকে দেখতে পেলে ছেলে তার খুশিই হবে।

চাল পেয়ে লোকটা তার কলের গানের বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেললো। না, ভেতরে কেউ নেই। একেবারেই ফাঁকা। লোকটা তখন বললো,–খোকা বাবু, এর মধ্যে বসে কেউ গান গায় না। এই যে কুকুর মার্কা স্লেটটা দেখছো, এর নাম রেকর্ড। আর এই যে ছোট্ট সুই-এটার নাম পিন। রেকর্ডের উপর পিনটা লাগিয়ে দিলে এর মধ্য থেকে গান বেরিয়ে আসে।

—এই রেকর্ড পাওয়া যায় কোথায় ?

—এবার একটা বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছো। এই রেকর্ড তৈরি হয় কোলকাতায়। সেখানে একদল লোক আছে। তারা শিল্পীকে দিয়ে গান করায়। তারপর এই রকম রেকর্ড তৈরি করে বিক্রি করে আমাদের কাছে।

www.pathagar.com

কলের গানওয়ালা চলে গেলো। আনমনা করে রেখে গেলো আব্বাস উদ্দীনকে। এই রকম গলায় গান গাইতে হবে। তাহলে তার গানও গ্রামের পর গ্রাম বাজিয়ে বেড়াবে এই ধরনের লোকেরা। কতো আনন্দই না হবে। কিন্তু সেদিন কবে আসবে ?

বাড়ির আঙিনাতে রয়েছে একটা ইঁদারা। লম্বা রশির মাথায় বালতি বাঁধা। ইঁদারার মধ্যে মুখ ঝুঁকিয়ে পানি তুলতে হয়। একদিন আব্বাস পানি তুলছেন। এমন সময়ে ডাকলো তার মা। আব্বাস সাড়া দিলেন তার মার ডাকে। ওমনি প্রতিধ্বনি হলো তা ইঁদারার মধ্যে। বড় সুন্দর মনে হলো তা আব্বাসের। ইঁদারার মধ্যে নিজের কণ্ঠকেই অবিকল শুনতে পাচ্ছেন খানিক বাদে।

মজার ব্যাপার। ঠিক কলের গানের মতোই ইঁদারার মধ্যে নিজের গলা শোনা। আব্বাস 'আ' করলে প্রতিধ্বনি 'আ'ই হয়। আব্বাস গান গাইলেন। প্রতিধ্বনিতে সেই গানই ফিরে এলো তার কানে। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে আব্বাস ডেকে নিয়ে এলেন তার মাকে, বড় ভাইকে। শুনে যাও, কলের গান।

আব্বাসের কান্ড দেখে মা হাসেন। বলেন,–পাগল ছেলে। এটা নতুন কিছু নয়। ইঁদারার মধ্যে মুখ নিয়ে কথা বললে তা ফিরে আসে।

মা বিষয়টি হেসে উড়িয়ে দিলেও আব্বাস মন থেকে মুছতে পারেন না। কারণে-অকারণে ইঁদারার কাছে যান। ঝুঁকে পড়ে গান ধরেন। প্রতিধ্বনিতে সেই গান ফিরে এসে কানে বাজে। বড় সুন্দর মনে হয় তার নিজের কণ্ঠকে।

আব্বাসের বাড়ির পূব দিকে এক সাথে দেড়শো বিঘের একটা খাস জমি। আধিয়ারী প্রজারা সেখানে হাল চাষ করে। মাঝে মাঝে তাদের তামাক দিয়ে আসতে হয়। দায়িত্বটা পড়ে আব্বাসের উপর।

কল্কিতে তামাক সেজে মাঠে নিয়ে যান। কৃষাণরা খুবই ভালো বাসে মনিবের এই ছোট্ট ছেলেটিকে। কেউ কেউ আদর করে তাকে গল্প শোনায়। গ্রাম বাংলার দৈত্য-দানবের গল্প। কিন্তু গল্পের চেয়ে তাদের গাওয়া গানই আব্বাসের বেশি পছন্দ। খালি গলায় কি সুন্দর সুর তোলে তারা। করুণ আর মিষ্টি সুরের ভাওয়াইয়া গান বিমোহিত করে তাকে। আব্বাস গান শুনতে চান। তারা লাঙল চষে আর গান ধরে। সেই গান শুনে আব্বাস তা উঠিয়ে নেন নিজের কণ্ঠে। তারপর ঠিক ঐ সুরেই গান ধরেন। বিস্মিত হয় আধিয়ারী কৃষাণেরা। এতোটুকু ছেলের কতোই না গুণ। এছেলে সত্যিই একদিন বড় গাইয়ে হবে।

www.pathagar.com

দুই

কুচবিহার শহরে আর মন টেকে না। এখানে গলা ছেড়ে গান গাওয়া যায় না। জেলা শহরে নানা রকমের মানসিকতা সম্পন্ন লোকের বাস। লোকজনের মধ্যে হৃদ্যতার বড় অভাব। আব্বাস তাই আর থাকতে চাইলেন না এখানে। বায়না ধরলেন, তুফানগঞ্জের স্কুলে ভর্তি হবেন।

বাবা আর আপত্তি করলেন না। তিনি তুফানগঞ্জে ওকালতি করেন। বাপ-বেটা এক শহরেই থাকা যাবে।

তুফানগঞ্জে স্কুলে ভর্তি হলেন আব্বাসউদ্দীন। এখানে এসে আরেক দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হলো। সরকারি ডাক্তার মোবারক হোসেন অর্গান বাজিয়ে ভালো রবীন্দ্র সংগীত করেন। খোঁজ পেয়ে আব্বাস গেলেন তার বাসায়। ডাক্তার সাহেবও তারিফ করলেন আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠের। রবীন্দ্র সংগীতের সুর শিখিয়ে দিতে লাগলেন তাকে। অনেক সময় দু'জন একত্রে গান করেন। বয়সের ব্যবধান ভুলে যান তারা। আব্বাস তার কাছেই শিখলেন বাঁধা সুরে গান গাইতে।

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলো। আব্বাস প্রথম স্থান দখল করলেন। মোবারক হোসেন সাহেব খুশি হলেন আব্বাসের চাইতে বেশি। তার ছাত্র-বন্ধু প্রথম হয়েছে, তিনি আবার এই স্কুলের মেম্বার। স্কুলের পুরস্কার বিতরণের দিন তিনি একটা প্রস্তাব রাখলেন। যে ছেলে স্কুলে ভালো গান গাইতে পারবে তাকে দেওয়া হবে পুরস্কার--দশ টাকার বই। দশ টাকার বই মানে অনেক বই।

প্রতিযোগিতা শুরু হলো। নির্বাচক মন্ডলী আব্বাসকেই প্রথম বলে বিবেচিত করলেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে আব্বাস গাইলেন 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া'। আব্বাসের কণ্ঠে এই গানটি খুবই প্রশংসিত হলো। অনুষ্ঠানে বার বার তাকে আসতে হলো মঞ্চে প্রথম পুরস্কার নেওয়ার জন্য। ভালো ছাত্রের জন্য প্রথম পুরস্কার, ভালো আচরণের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, সর্বাধিক উপস্থিতির জন্য সেরা পুরস্কার আর ভালো গান গাইবার জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তুফানগঞ্জের সুধিমহল অভিভূত হয়ে গেলো একটি ছেলের এতোগুলো গুণের সমাবেশ দেখে। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি গানটাও তিনি গাইলেন 'সভা যখন ভাঙবে তখন শেষের গানটি যাব গেয়ে'। এই গানটিও শ্রোতারা উপভোগ করলেন দারুণভাবে। ধন্য ধন্য রব পড়ে গেলো আব্বাসের নামে।

গ্রাম থেকে আসা তাও মুসলমান ঘরের ছেলে এতোগুলো পুরস্কার জিতে নিলো অনেকের তা সহ্য হলো না। একদিন সংস্কৃতের শিক্ষক আব্বাসকে খাটো

www.pathagar.com

করার জন্য ক্লাসের মধ্যেই বললেন,–তোমাকে ঠিক বামুনের ছেলে বলেই মনে হয়। সব দিক দিয়েই তুমি চৌকশ।

আব্বাস আর রাগ সামলাতে পারলেন না। রাগের মাথায় বলে ফেললেন,–আপনাকেও স্যার মুসলমানের মতো মনে হয়।

—কেন মুসলমানের মতো মনে হয় ?

—আপনার চেহারা ঠিক মুসলমান রাজা-বাদশাদের মতো। শুধু মুখে দাড়ি নেই।

রাজা-বাদশার সাথে তুলনা করাতে শিক্ষক মহোদয় আর উচ্চবাচ্য করলেন না। আব্বাসের খোঁচাটা নীরবে হজম করলেন।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো অন্যখানে। মুসলমান ছাত্রদের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নিতে হয় সংস্কৃত। আব্বাসকেও তাই নিতে হয়েছে। সংস্কৃতের শিক্ষক এই সুযোগটা কাজে লাগালেন। সংস্কৃত ক্লাসে আব্বাসকে তিনি নানা প্রশ্ন করে নাজেহাল করে ছাড়তে লাগলেন।

লেখাপড়ার বিষয়ে আব্বাস ভীষণ জেদী। হার মানার পাত্র তিনি নন। হিন্দু পৌরানিক কাহিনী ও সংস্কৃত ভাষা চর্চায় তিনি যথেষ্ট সময় দিতে লাগলেন। তার ফলও পেলেন হাতে হাতে। তুফানগঞ্জের নামকরা সংগঠন 'আর্য সাহিত্য পরিষদ' থেকে তাকে 'কাব্য রত্নাকর' উপাধি দিয়ে সম্মানীত করা হলো। সংস্কৃত ভাষায় অগাধ দখল ও বাংলা সাহিত্য চর্চায় অবদান রাখার জন্য এই সম্মান দেওয়া হলো তাকে।

মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার সময় এলো। টেস্ট পরীক্ষায় মাত্র সাত জন ছেলে পাশ করলেন। পরীক্ষায় যাতে তারা ভালো করতে পারেন এজন্য শিক্ষকদের চেষ্টার অন্ত নেই। স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোপাল চক্রবর্তী। ছাত্র অন্ত প্রাণ। তিনি উদ্যোগ নিলেন, সন্ধ্যার মধ্যেই খাবার খেয়ে তার বাসায় যেতে হবে পড়তে। রাত বারোটা পর্যন্ত ছাত্রদের তিনি পড়াবেন।

কয়েকদিন এভাবে চললো। তারপর একদিন তিনি বললেন,–কাল থেকে তোমরা আর রাতের খাবারটি হোস্টেল থেকে খেয়ে আসবে না।

—কেন স্যার ? জানতে চাইলো একজন ছাত্র।

—আমি লক্ষ্য করছি, রাত দশটা বাজতেই তোমাদের চোখ লাল হয়ে আসে। পড়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে কষ্ট হয়।

—ঠিকই বলেছেন, স্যার। দশটার পরে আমরা আর মনোযোগ দিতে পারি না লেখাপড়ার দিকে। ঘুম আসে শুধু।

www.pathagar.com

—এর জন্য তোমাদের অবশ্য দোষ দেওয়া চলে না। সন্ধ্যার সময় পেট ভরে খেলে দশটার সময় ঘুম না এসে যাবে কোথায় ? কাল থেকে তোমরা আমার এখানে খাবে। কিন্তু দশটার আগে নয়।

তাই হলো। পরীক্ষা দেওয়ার আগ পর্যন্ত রাতের খাবারটি স্যারের বাসাতেই খেতে হলো। প্রায় তিন মাস ধরে চললো এই ব্যবস্থা।

আরো একটি বাড়তি সুবিধা পাওয়া গেলো স্যারের বাসাতে। স্যারের ছোটভাই শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনা করেন। ছুটিতে তিনি তুফানগঞ্জে এসেছেন দাদার বাড়িতে বেড়াতে। আব্বাস অংকে একটু কাঁচা। অধ্যাপক মহাশয় দায়িত্ব নিলেন আব্বাসকে অংক শেখানোর। এতে তার অনেক উপকার হলো। অংকের কঠিন বিষয়গুলো সহজভাবে ধরে নিতে পারলেন। অধ্যাপক মহোদয় বন্ধুর মতো ব্যবহার করেন আব্বাসের সাথে। মাঝে মাঝে দু'জন বের হন বেড়াতে। নদীর ধারে বসে আব্বাস গান ধরেন। অধ্যাপক মহোদয় তন্ময় হয়ে তা শোনেন। তারিফ করেন আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠের।

অবশেষে শুরু হলো মেট্রিক পরীক্ষা। আব্বাস অনেক সুন্দর পরীক্ষা দিলেন। তিন মাস স্যারের বাসাতে একটানা পড়াশুনা করাতে পাঠ্য বইয়ের সবকিছু দখলে এসেছে তার। ভয় ছিল অংকে। কিন্তু সব চেয়ে ভালো করলেন তিনি এই বিষয়ে। একটা অংকও ভুল করলেন না পরীক্ষার খাতায়।

পরীক্ষা শেষে আব্বাস ফিরে এলেন গ্রামে। হাতে কোনো কাজ নেই। আব্বাসের মনে নতুন এক চিন্তার উদয় হলো। তুফানগঞ্জে তিনি দেখেছেন, মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল। বলরামপুরে মেয়েদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। কুচবিহারের মহারাজা বিষয়টির দিকে নজর দিলে এতোদিন হয়তো মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার একটা ব্যবস্থা হতো। মহারাজা শুধুমাত্র পশু-পাখি শিকার করার জন্য মাসব্যাপী ক্যাম্প করেন টাকোয়ামারীতে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেন এর পেছনে। কিন্তু কুচবিহারের বহু মেধাবী ছেলে মেয়ে টাকার অভাবে লেখাপড়া করতে পারে না। সারা কুচবিহার রাজ্যে মেয়েদের জন্য আলাদা কোনো কলেজ নেই। হাইস্কুল যা আছে তা মহকুমা শহরে।

গ্রামের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য একটা হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। আব্বাসউদ্দীন নিলেন সেই উদ্যোগ। পরিকল্পনাটা পাড়লেন তার পিতার কাছে।

—মেয়েদের লেখাপড়ার দিকে গ্রামের কারো উৎসাহ দেখিনা। পুত্রকে নিরাশ করলেন পিতা।

www.pathagar.com

—স্কুল নেই বলে উৎসাহ নেই। স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে তারা মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে পাঠাবে। আব্বাসও ছাড়বার পাত্র নন।

—তা হলে গ্রামে একটা সভা ডাকা যায়। তোমার উদ্দেশ্যের কথা বলতে পারো অভিভাবকদের।

তাই হলো। একটা সভা আহ্বান করলেন আব্বাসউদ্দীন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর গুরুত্ব বর্ণনা করে একটা লম্বা বক্তৃতা দিলেন তিনি। তার কথায় কাজ হলো। ব্যবসায়ীরা স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য নগদ টাকা দিয়ে সাহায্য করলেন। আর যারা নগদ টাকা দিতে পারলেন না তারা দিলেন গোলার ধান।

এইভাবে গ্রামে একটা টিনের স্কুলঘর তৈরি হয়ে গেলো। বৃদ্ধ পন্ডিত নাসেরউদ্দীন সাহেব স্বেচ্ছায় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিলেন। বাড়িতে বাড়িতে চললো প্রচারণা। ৮৯ জন ছাত্রীও ভর্তি হলো স্কুলে। স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা হিসেবে আব্বাসউদ্দীনের নাম ছড়িয়ে পড়লো আশপাশের গ্রামে।

এই সময়ে আব্বাসের মনে হলো, বিয়ে করে সংসারী হলে কেমন হয়। মা একা ঘরের কাজ করে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। বড় সংসারে একটা বউ এলে মার কাজে সাহায্য হতো। মেয়েও মোটামুটি তার একটা দেখা আছে। কথা হয়েছে, পছন্দও হয়েছে।

মার কাছে কথাটা পাড়লেন আব্বাসউদ্দীন। মেয়েটার কথা বলতে যেয়ে কেঁদেই ফেললেন তিনি। এটা আব্বাসউদ্দীনের দোষ নয়। শিল্পী-সাহিত্যিকগণ একটু আবেগ প্রবণ হয়ে থাকেন।

মা আব্বাসের বিয়ের কথাটা জানালেন বাবার কাছে। শুনে বাবা মোটেও রাগ করলেন না। তবে মর্মাহত হলেন খানিকটা। বললেন,–আমার বড় আশা খোকার উপর। আমি উকিল মানুষ। সুযোগ হয়নি ব্যারিস্টারী পড়ার। আমার ইচ্ছা, বিয়ের আগে ছেলেকে বি, এ পাশ করতে হবে। ব্যারিস্টারী পড়তে হবে।

—বিয়ে করলেও লেখাপড়া শেখা যায়।

—সব সময় যায় না। আমি নিজেই তার প্রমাণ। সংসারের প্রতি একবার মন বসে গেলে লেখাপড়ার প্রতি মন উঠে যায়।

—তা হলে কি করবো ? নিষেধ করে দেবো আব্বাসকে ?

—তার দরকার নেই। বিয়ের প্রস্তাব পাঠাও মেয়ের বাড়িতে।

বিয়ের কথা শুনে সবাই খুব খুশি হলো। কিন্তু যার খুশি হওয়ার কথা সেই আব্বাস কেমন যেন হয়ে গেলেন। বি, এ পাশ করতে হবে, ব্যারিস্টারী পড়তে হবে-বাবার এই কথাটা তার মনে দোলা দিতে লাগলো।

www.pathagar.com

এক গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলো আব্বাসউদ্দীনের। ঘরের দরজা খুলে এলেন বাইরে। একটু আগে কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে গেছে। প্রকৃতি এখন শান্ত। আকাশে এক ফালি চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু চাঁদের আলোয় সব কিছু যেন মলিন, বিবর্ণ। আব্বাসের মনে হলো সাময়িক মোহে পড়ে তিনি যা করতে যাচ্ছেন তা এই কাল বৈশাখী ঝড়ের মতো। পিতার মনে ব্যথা দিয়ে তিনি বধূ আনতে যাচ্ছেন। প্রকৃতি যেমন ঝড়ের পরে আবার সব কিছু গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টায় রত, তার পিতাও হয়তো সব কিছু ভুলে যাবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আব্বাসউদ্দীন কী পারবেন ভুলতে ? পিতার মুখে সর্বদা তিনি বিবর্ণ হাসিটাই হয়তো দেখতে পাবেন।

সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন আব্বাসউদ্দীন। না, এখন বিয়ে নয়। পিতার আকাঙ্খা আগে তাকে পূরন করতে হবে। বি, এ পাশ করতে হবে। একটি মেয়ের সাময়িক মোহে পড়ে জীবনকে ভুল পথে পরিচালিত করা যাবে না। বড় জিনিস লাভ করতে হলে বড় ত্যাগ আর সাধনা দরকার হয়। তাই মাকে জানিয়ে দিলেন, এখন বিয়ে নয়।

মেট্রিক পরীক্ষার ফল বের হলো। কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে পাশ করলেন আব্বাসউদ্দীন। সারা গ্রামে আনন্দের বন্যা। প্রথম বিভাগে পাশ করে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছেন তিনি।

কলেজে ভর্তি হবার জন্য আব্বাস এলেন কুচবিহারে। একটা মাত্র কলেজ। ভর্তি হলেন সেখানে।

এর আগে স্কুল জীবনে কুচবিহারে কিছুদিন লেখাপড়া করেছেন আব্বাসউদ্দীন। শহরটি আগেই তার পরিচিত। গায়ক হিসেবে ইতোমধ্যে তার বেশ নামও হয়েছে। স্কুল কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান শোনাবার দাওয়াত আসে।

কলেজে এসে ভালো একজন সহপাঠী পেলেন আব্বাসউদ্দীন। নাম সত্য নারায়ণ। বন্ধুটির অনেক গুণ। যেমন ভালো অভিনয় করেন, ভালো তবলা বাজাতে পারেন আবার কবিতাও লেখেন চমৎকার। কলেজ ছুটির পর প্রায়ই তার বাসায় আসর বসে গানের। যোগাড় হয় সাত আট জন গায়ক। একে একে গান শোনান তারা। এই আসরে আব্বাস নিয়মিত হাজিরা দিতে লাগলেন। তাতে লাভ হলো, তবলার সাথে তাল সহযোগে গান গাওয়ার তালিম পেলেন তিনি।

একদিন আব্বাস শুনতে পেলেন কুচবিহারে দু'জন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর পদের জন্য দরখাস্ত চাওয়া হয়েছে। খবরটি দিলেন তার হোস্টেলের একজন ছাত্র। দরখাস্ত সেও দিয়েছে। আব্বাসও দিলেন।

www.pathagar.com

যথা সময়ে ডাক পড়লো আব্বাসউদ্দীনের পুলিশ সুপারের অফিসে। আব্বাসকে দেখে পুলিশ সুপার মিঃ লেসলী অবাকই হলেন। এই ছেলে শহরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে বেড়ায়। এ আবার করবে চাকরি ?

বিরক্ত হয়ে পুলিশ সুপার তাই নানা ধরনের প্রশ্ন শুরু করলেন। আগেই বলা হয়েছে, আব্বাস যে শুধু গান গাইতেন তা নয়। স্কুল জীবনে তিনি ছিলেন একজন গর্ব করার মতো ছাত্র। কঠিন সব প্রশ্ন করেও মিঃ লেসলী আটকাতে পারলেন না আব্বাসকে। খুশিই হলেন তিনি। এমন চৌকশ ছেলে দরকার তার বিভাগে। তিনি এতোই প্রীত হলেন যে, ইন্টারভিউ শেষে আব্বাসের হাতে ধরিয়ে দিলেন নিয়োগপত্র।

আব্বাস তো মহা খুশি। হোস্টেলে এসে বন্ধুদের দেখালেন নিয়োগপত্র খানা। ইন্টারভিউ দিতে এসে হাতে হাতে কেউ নিয়োগপত্র আনতে পারে এটা জানা ছিল না বন্ধুদের। অবাক হলো তারাও। মিষ্টি খাওয়াতে হলো আব্বাসকে।

দারোগাগিরীর এই চাকরি আব্বাসের কিন্তু করা হলো না। পুলিশ সুপারের অফিসে চাকরি করেন রাধাশ্যাম চক্রবর্তী নামে একজন দারোগা। এক সময়ে তিনি তুফানগঞ্জ মহকুমায় চাকরি করেছেন। সে সময়ে আব্বাসদের পরিবারের সাথে বেশ হৃদ্যতা গড়ে ওঠে তার। আব্বাসকে তিনি এতো স্নেহ করেন যে সবখানে বলে বেড়ান, আব্বাস তার ছেলে।

ইন্টারভিউয়ের দিন রাধাশ্যাম বাবু শহরের বাইরে ছিলেন। এসে শুনলেন, আব্বাসের চাকরি হয়েছে তাদের অফিসে। খবরটা শুনে তিনি সোজা ঘেয়ে ঢুকলেন পুলিশ সুপারের কক্ষে।

—স্যার,আপনি নাকি আব্বাসকে সাব-ইন্সপেক্টরের নিয়োগপত্র দিয়েছেন ?

—ঠিকই শুনেছো। ছেলেটা দারুণ বুদ্ধিমান। এমন চৌকশ ছেলেই দরকার আমাদের। পাঁচ দিনের মধ্যে তাকে জয়েন করতে বলেছি।

—আপনার এই নিয়োগপত্র বাতিল করতে হবে। খুঁজতে হবে অন্য ছেলে।

—তোমার কথার কিছুই বুঝছি না। তোমার কথা শুনতে হবে নাকি ?

—আলবৎ শুনতে হবে। আমার ছেলেকে আমি পুলিশের চাকরি করতে দিতে পারি না। আগে ও বি, এ পাশ করবে। তারপর অন্য চিন্তা।

—তুমি 'চক্রবর্তী' আর আব্বাস হলো 'উদ্দীন'। বাপ-বেটার এমন পদবী যোগাড় হলো কি করে ?

—সেটা আমাদের পারিবারিক বিষয়। আমি ওকে ছেলেবেলা থেকে নিজের ছেলে বলে জানি। ওর বাবা আমাকে তেমন ভাবার সাহসও দিয়েছেন। আমি জানি, একবার চাকরির মোহে পড়লে বি, এ পাশ করা আর তার হবে না।

www.pathagar.com

—ঠিক আছে, তুমি আব্বাসকে বলো দেখা করতে। আমি সবকিছু তার মুখে শুনতে চাই।

আব্বাসের কানে গেলো কথাটি। পাঁচ দিন কেন, পুরো একটা মাস আর গেলেন না চাকরির খোঁজ নিতে। না গেলেন কোনো আড্ডায়, না গেলেন কোনো অনুষ্ঠানে। তারপর যখন জানতে পারলেন তার বদলে অন্য লোক নেওয়া হয়েছে তখন গেলেন রাধাশ্যাম বাবুর বাসাতে। ইতোমধ্যে অবশ্য রাধাশ্যাম বাবুর রাগ পড়ে এসেছে। আব্বাসকে দেখে তিনি বললেন,–তোমার বাবার চিঠি পেয়েছি। দারোগাগিরীর মোহ থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে পেরেছি বলে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আমাকে।

আই, এ পরীক্ষা শেষ হলো। ভালোই পরীক্ষা দিলেন আব্বাসউদ্দীন। পরীক্ষা শেষে চলে এলেন গ্রামে। এই সময়ে গ্রামে তার এক হিন্দু বন্ধু প্রস্তাব দিলো তার বিয়েতে যেতে হবে 'মাড়োয়ার' এ। মাড়োয়ারের অধিবাসীদেরই আমরা বলে থাকি মাড়োয়ারী।

বাবা কিন্তু কিছুতেই রাজী হতে চাইলেন না। মাড়োয়ার কুচবিহার হতে চার দিনের পথ। তাছাড়া আব্বাস মাসাধিকাল থাকবেন। এজন্যই অমত করলেন তিনি।

আব্বাস নাছোড় বান্দা। পরীক্ষা শেষে তিন মাস গ্রামে বন্দী হয়ে থাকতে তিনি নারাজ। বাধ্য হয়ে মত পাল্টাতে হলো বাবাকে। অনুমতি দিলেন কিন্তু সাবধানে থাকতে বললেন।

সত্যি সত্যি মাড়োয়ার পৌঁছাতে চারদিন সময় লাগলো। এখানে এসে আব্বাস অবাক হয়ে গেলেন। ঘরে ঘরে প্রাচুর্যের সমারোহ। এক একটা বাড়ি যেন বাংলাদেশের এক একটা জমিদার বাড়ি। উঁচু উঁচু ঘর। ঘরে তৈজসপত্রে ঠাসা। পথে চারদিন ভাতের সাথে দেখা হয়নি। আব্বাস তাই আগে পেট ভরে ভাত খেয়ে নিলেন।

বন্ধুকে নিয়ে তিনি বের হলেন গ্রাম দেখতে। সবকিছু অপূর্ব মনে হলো তার। পাহাড়ের ধারে হরিণ আর ময়ুর দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আকাশে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছে মাড়োয়ারের পাহাড়।

মাড়োয়ারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আব্বাসকে মুগ্ধ করলো দারুণভাবে। তার কাব্যিক মন ছাড়তে চাইলো না মাড়োয়ার। প্রায় দুই মাস তিনি রয়ে গেলেন মাড়োয়ার।

এবার ফেরার পালা। আব্বাস ভাবলেন, দেশ ভ্রমণের এই সুযোগটা ছাড়বেন কেন ? প্রথমে এলেন তিনি জয়পুরে। পাহাড়ের উপর রাজা মানসিংহের

www.pathagar.com

রাজ-প্রাসাদ দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। ইতিহাসের নানা ঘটনা তার মনে আলোড়ন তুললো। যশোরের একটা বিরাট কালী মূর্তি তিনি দেখতে পেলেন প্রাসাদের একটি কক্ষে। কালী মূর্তির চোখ দুটো সোনার তৈরি। ঠিক যেন বিকট এবং রুদ্র মূর্তিতে তাকিয়ে আছে অভ্যাগতের দিকে।

জয়পুর থেকে আব্বাস গেলেন আজমীর। জেয়ারত করলেন খাজা মইনুদ্দীন চিশতীর মাজার। দেখলেন ইতিহাস বিখ্যাত সেই আনা সাগর।

আজমীর থেকে এলেন আগ্রায়। তাজমহল দেখে মহা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। বিশ হাজার কারিগর বাইশ বছর সময় নিয়েছিলেন এই তাজমহল তৈরি করতে। সম্রাট শাহজাহান অপূর্ব ধৈর্য আর অসীম একাগ্রতা নিয়ে কাজ করেছিলেন। শাহজাহানের মতো এতো ধৈর্য আর শিল্প চেতনার অভাবেই হয়তো পৃথিবীর বুকে আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় কোনো তাজমহল গড়ে উঠেনি।

ছলছল চোখে আগ্রাকে বিদায় জানিয়ে আব্বাস এলেন কানপুর। এখানে তার স্কুল জীবনের এক সহপাঠী ব্যবসা করেন। উঠলেন তার ওখানে। বন্ধুটি কিছুতেই ছাড়তে চান না আব্বাসকে। এদিকে মশার কামড়ে অতীষ্ঠ হয়ে আব্বাস একদিন বেরিয়ে পড়লেন কুচবিহারের পথে।

কুচবিহারে কলেজ হোস্টেলে এসে তিনি যখন পৌছলেন গায়ে প্রচন্ড জ্বর আর ব্যথা। দীর্ঘ দিন পরে তাকে দেখে বন্ধুরা এগিয়ে এলো। বললো,–বন্ধের সময় আবার হোস্টেলে এলি কেন ?

—বাড়িতে ছিলাম না। মাড়োয়ারে গিয়েছিলাম বেড়াতে। বাড়িতেই ফিরবো। কিন্তু শরীর ভালো নেই বলে হোস্টেলে এসে উঠেছি।

—তোর মুখে এসব দাগ কিসের ? জানতে চাইলো বন্ধুরা।

—মশা কামড়িয়েছে। কানপুরে ভারি মশার উপদ্রব।

—মশার কামড়ে তো কাল কাল দাগ হবার কথা নয়। সন্দেহ করলো তার সহপাঠীদের একজন।

ডাক্তারকে খবর দেওয়া হলো। তিনি এসে জ্বর মাপলেন। তারপর কাল দাগ পরীক্ষা করে বললেন,–ওগুলো মশার কামড়ের দাগ নয়। গুটি বসন্ত। আব্বাসের বাড়িতে খবর দাও তাড়াতাড়ি।

গুটি বসন্তের খবর শুনে মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেলো হোস্টেল। ভয় পেয়েছে সাথীরা। ঘরে তিনি একা পড়ে রইলেন জ্বর নিয়ে। একটু পানি ঢেলে মাথাটা ধুইয়ে দেবে তেমন লোক নেই। গুটি বসন্ত মানেই মৃত্যুর পদধ্বনি। পালিয়েছে তাই সতীর্থরা।

www.pathagar.com

রেয়াজ মিয়া নামে একজন ছেলে এই ভয়ঙ্কর বিপদের দিনে আব্বাসের পাশে দাঁড়ালেন। খবর দেওয়া হলো তার বাড়িতে। পিতা জাফর আলী আহমদ গ্রাম থেকে এলেন হোস্টেলে।

পিতাকে কাছে পেয়ে আব্বাস শরীরে বল পেলেন। সাহসও বাড়লো। পিতা বললেন,–এমনি একটা অসুখ বাঁধাবে বলেই আমি তোমাদের চোখের আড়াল করতে চাইনে।

দু'দিন পরে আব্বাস একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। পিতা আর দেরি করলেন না। একটা গরুর গাড়িতে চড়ে পিতা-পুত্র রওনা হলেন বলরামপুরের উদ্দেশ্যে।

মায়ের অক্লান্ত সেবা আর পরিচর্যায় কিছুদিনের মধ্যে আব্বাস সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু গুটি বসন্তের কয়েকটি দাগ স্থায়ীভাবে রয়ে গেলো তার শরীরে।

আই, এ পরীক্ষার ফল বের হলো। প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে পাশ করলেন আব্বাসউদ্দীন।

কুচবিহার কলেজে বি, এ ভর্তি হবার কথা। কিন্তু আব্বাস গোঁ ধরলেন, কুচবিহারে আর নয়। তার অসুস্থতার দিনে হোস্টেলের ছাত্রদের আচরণ তাকে দারুণভাবে মর্মাহত করেছে। বিপদের দিনে যাদের কোনো সাহায্য না পেয়ে উপেক্ষিত হয়েছেন তাদের মধ্যে আর নয়। পিতার কাছে আব্বাস বায়না ধরলেন তাকে লক্ষ্মৌ মরিস মিউজিক কলেজে ভর্তি করে দেবার জন্য। কলেজে পড়াশুনাও হবে, গান বাজনার চর্চাও করা যাবে। পিতা রাজী হলেন না তাতে। একেতো দূরের পথ। তারপর মিউজিক কলেজে যেয়ে আব্বাস গান বাজনা নিয়েই পড়ে থাকবেন। লেখাপড়া হবে না।

আব্বাস রংপুর এলেন। ইচ্ছা, রংপুরের কলেজে ভর্তি হবেন। প্রথম দর্শনেই রংপুর তার পছন্দ হলো। অনেক জায়গা নিয়ে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত। ছাত্রাবাসগুলো খুবই সুন্দর। তাছাড়া বাড়তি সুবিধা হলো, মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা বেশি। যে বন্ধুর আহ্বানে রংপুর এসেছেন সেও খুশি হলো আব্বাসকে পেয়ে।

রাতে বন্ধুর খাটে শুয়ে পড়লেন আব্বাস। বন্ধুটি দিব্বি নাক ডেকে নিদ্রা দিচ্ছে। কিন্তু আব্বাসের চোখে ঘুম আর আসে না। মনে হলো, রাজ্যের যতো মশা আছে সব এসে হাজির হয়েছে হোস্টেলের এই রুমে। তাদের গুণগুণ ঐক্যতান কেড়ে নিলো আব্বাসের নিদ্রা। এই বুঝি সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে ছিঁড়ে ফেলবে মশারি। কিছুদিন আগে কানপুরের মশার কামড়ের কথা মনে হতে লাগলো তার। এখানে থাকলে নির্ঘাত তিনি আবার বড় ধরনের অসুখে পড়বেন। ভর্তি হওয়া যাবে না এখানে।

www.pathagar.com

এলেন রাজশাহীতে। রাজশাহী শহর তার দারুণ পছন্দ হলো। এখানকার খোলামেলা প্রাকৃতিক পরিবেশ আর শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বিশাল পদ্মা নদীর উন্মত্ততা প্রলুব্ধ করলো তাকে। ভর্তি হলেন তিনি রাজশাহী কলেজে।

রাজশাহীর দিনগুলো তার বেশ আনন্দে কাটতে লাগলো। ফুটবল খেলায়, গান বাজনায় কলেজের সেরা ছাত্র হিসেবে অচিরেই তিনি ব্যাপক পরিচিতি পেলেন। পড়াশুনা কিংবা নিয়মিত নামাজ আদায়ে তার জুড়ি নেই।

এই সময়ে দেশ বরেণ্য বৈজ্ঞানিক স্যার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এলেন রাজশাহীতে। তার সম্মানে রাজশাহীর ছাত্র সমাজ একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করলো। তখন স্বদেশীর যুগ। ইংরেজদের পণ্য বর্জনের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে ভারতবাসী। ঐ সম্বর্ধনা সভায় আব্বাস গাইলেন 'ঘোর ঘোর রে সাধের চরকা ঘোর' স্বদেশীদের এই বিখ্যাত গানটি। মফস্বল শহরের একজন ছাত্রের চমৎকার কণ্ঠে এই গানটি শুনে আচার্যদেব 'সাবাস সাবাস' বলে চিৎকার করে উঠলেন। স্থান-কাল ভুলে আব্বাসের পিঠে স্নেহপূর্ণ কিল মারলেন কয়েকটা। আচার্য দেবের স্বস্নেহ এই প্রেরণা তাকে গান গেয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে অনুপ্রেরণা যোগালো ভীষণভাবে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে আব্বাস বাড়িতে এলেন। বাড়িতে এসে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন জ্বরে। ভুগলেন একমাস। শরীর আর ঠিক হতে চায় না। আব্বাসের এই অসুস্থতা মাকে উৎকণ্ঠায় ফেললো। রাজশাহীতে ফিরে গেলে আবার যদি তার জ্বর হয়,দেখবে কে ? শেষে তিনি বললেন,–কাজ নেই তোমার রাজশাহীতে পড়ে। কুচবিহারই ভালো। সব সময় সংবাদ পাওয়া যায়। ভর্তি হও কুচবিহারে।

মায়ের কথার অবাধ্য হননি আব্বাস কখনো। এবারও ফেলতে পারলেন না মায়ের আদেশ। বদলি সার্টিফিকেট এনে ভর্তি হলেন কুচবিহার কলেজে। রাজশাহীর সহপাঠীরা হারালো একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে।

কুচবিহারে এসে প্রাণ ফিরে পেলেন আব্বাসউদ্দীন। এবার আর শুধু গান নয়, সাহিত্য সাধনায়ও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। শহরে বিভিন্ন সাহিত্য মজলিশে তার উপস্থিতি বাড়লো। বিভিন্ন সাময়িকীর সাথে জড়িত হয়ে পড়লেন। তার লেখা প্রকাশিত হতে লাগলো নিয়মিত।

কাজী নজরুল ইসলাম তখন গানে গানে মাতিয়ে তুলেছেন ভারতবর্ষ। শুধু গান নয়, সাহিত্য সাধনায়ও তিনি হৃদয় ছুঁয়েছেন ভারতবাসীর। কুচবিহারের ছাত্র সমাজ ঠিক করলো, তাদের বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে দাওয়াত দেওয়া হবে বর্ধমান জেলার এই কবিকে।

www.pathagar.com

দাওয়াত পেয়ে কবি নজরুল এলেন কুচবিহারে। ইতোমধ্যে আব্বাস কবিতা রচনা করে, গান গেয়ে ছাত্র সমাজের মধ্যমণিতে পরিণত হয়েছেন। তাই কুচবিহারের এই গায়ক-কবির কামরাতে থাকার ব্যবস্থা করা হলো নজরুলের। আব্বাসও দারুণ পুলকিত হলেন নজরুলের সান্নিধ্য লাভ করে।

অন্তরঙ্গ আলোকে কবি নজরুলের সাথে পরিচিত হলেন আব্বাসউদ্দীন। কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটা গল্প আব্বাস দেখালেন নজরুলকে। লেখাটার প্রশংসা করলেন কবি। তবে রহস্য করে বললেন,–নামের পিছনে ঐ লেজটা লাগিয়েছ কেন ?

আর্য সাহিত্য পরিষদ থেকে পাওয়া 'কাব্য রত্নাকর' উপাধিটা নামের সাথে দিয়েছিলেন। এটা দেখে খোঁচা দিলেন নজরুল। বললেন,–অল্প বয়সে এই লেজ লাগাবার দরকার নেই। লেখা ভালো হলে পাঠক এমনিতে পড়বে, লেজ দেখে পড়বে না।

কবির এই মন্তব্যে আব্বাস লজ্জা পেলেন বেশ। ঠিক করলেন, এখন থেকে এই উপাধিটা আর লাগাবেন না কখনো।

দুপুরের পরেই শুরু হলো মিলাদ মাহফিলের কাজ। শুধু ছাত্ররা নয়, কাজী নজরুলকে এক নজর দেখার জন্য মজলিশে হাজির হলো শহরের গণ্যমান্য মুসলিমগণ।

আসরের ওয়াক্ত হলো। নামাজের জন্য দেওয়া হলো কয়েক মিনিটের বিরতি।

নামাজের পরে শুরু হলো আবার মিলাদ মাহফিলের কাজ। এবার নজরুলের বক্তৃতা দেবার পালা। তিনি উঠলেন। বললেন,–আপনারা আমাকে মিলাদ মাহফিলে ডেকে এনে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু শুনবেন আশা করেছেন। কিন্তু আমি ভালো বক্তা নই। বক্তৃতা দিতে উঠলেই আমি কথার খেই হারিয়ে ফেলি। আমার যা বক্তব্য তা গানে গানে বলারই চেষ্টা করবো।

গানের কথা শুনে মৌলভীরা ক্ষেপে উঠলো। তারা এসেছে মিলাদ মাহফিলে। তাই প্রতিবাদ করে তারা বললো,–গান নয়, ধর্ম সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।

—ধর্ম সম্বন্ধে আমি কি বলবো। এই দেখুন, আমার মুখে দাড়ি নেই। যৌবনই আমার ধর্ম। সাম্যই আমার ধর্ম। বর্তমানে দেশের কাজ করাকে আমি ধর্ম বলে মনে করি। পরাধীনতার গ্লানি আপনারা আর কতোদিন বয়ে বেড়াবেন? মুসলমানরা এদেশে পাঁচশত বছর রাজত্ব করেছেন। আমরা রাজা-বাদশার জাত। পরাধীন দেশে আমরা নামাজ পড়ি কি করে ? দেখলেন তো, আমি

www.pathagar.com

আসরের নামাজ পড়লাম না। আমার দেশ স্বাধীন না হলে আজ নামাজ পড়তে বসলে ইংরেজ আমার জায়নামাজ কেড়ে নিতে পারে------

কবি তার বক্তব্য শেষ করতে পারলেন না। মিলাদে আগত মুসল্লিগণ দাঁড়িয়ে পড়লেন। কবি নামাজ পড়েননি। তারপর আবার নামাজ না পড়ার ঠুনকো কৈফিয়ৎ। বেশ একটা হট্টগোল বেঁধে গেলো মাহফিলে। অবস্থা বেগতিক দেখে ছাত্ররা সরিয়ে নিয়ে এলো কবিকে মাহফিল থেকে।

হোস্টেলে এসে কবি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। উদ্ধারকারী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন,–আমি আগেই বলেছিলাম, আমি বক্তৃতা দিতে পারি না। মিলাদ মাহফিলে না এনে আমাকে গানের অনুষ্ঠানে আনলে ভালো করতে। গানে গানে শোনাতে পারতাম অনেক কথা।

ছাত্ররা কম যাবে কেন ? কুচবিহার ক্লাব প্রাঙ্গনে তারা গোপনে আয়োজন করলো এক সংগীত সভার। রাতের সে অনুষ্ঠানে কবি একে একে অনেক গান গেয়ে শোনালেন। শোনালেন তার লেখা শিকল ভাঙার গান, চরকার গান, জাতের নামে বজ্জাতির গান।

কোলকাতায় ফেরার কথা ভুলে গেলেন নজরুল। বললেন,–কুচবিহার আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। দু'দিন থাকবো আমি এখানে। এই জমানায় শিল্পী-সাহিত্যিকদের কেউ মর্যাদা দেয় না। কিন্তু কুচবিহারের ছেলেরা আমার জন্য যথেষ্ট করেছে। এদের আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ। তবে আমাকে আর মিলাদ মাহফিলে দাঁড় করিও না। গানের জলসার ব্যবস্থা করো।

কবির কথা শুনে ছেলেরা আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। গানের কথা শুনে আনন্দিত হলো তারা। একজন বললো,–আমাদের আব্বাস কিন্তু গান গাইতে পারে। ভারি সুরেলা কণ্ঠ ওর।

—আগে বলবে তো। কোথায় আব্বাসউদ্দীন ? গত রাতের জলসায় আমি একা গান গেয়ে হয়রান হয়েছি। একজন সঙ্গী পেলে তো মন্দ হতো না।

ছেলেরা আব্বাসকে নিয়ে এলো কবির সামনে। তাকে দেখে কবি বললেন,–এতো 'কাব্য রত্নাকর' আবার আমার সঙ্গী 'রজনী রত্নাকর'। এযে 'সংগীত রত্নাকর' তা তো বলেনি ?

কবির কথা শুনে হেসে উঠলো ছাত্ররা। কবি বললেন,–গান ধরো একটি।

সহপাঠীরা ঘরের মধ্যে নিয়ে এলো একটা হারমোনিয়াম। এটা দেখে কবি অবাক হলেন। গত রাতে মৌলভীদের তাড়া খেয়েছেন। সেই মুসলমান ঘরের একজন ছেলে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইবে—অকল্পনীয় ব্যাপার।

www.pathagar.com

আব্বাসউদ্দীন হারমোনিয়াম টেনে নিলেন কোলের কাছে। দক্ষ হাতে সঞ্চালন করলেন রিডগুলো। তারপর গাইলেন 'সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে' রবীন্দ্র সংগীতটি।

গান শেষ হতেই লাফিয়ে উঠলেন নজরুল। এতোটা তিনি আশা করেননি মফস্বল কলেজে পড়ুয়া একজন মুসলমান ছাত্রের কাছে। নজরুলকে উচ্চসিত হতে দেখে কলেজের ছেলেরাও পুলকিত হলো।

আব্বাসের পিঠ চাপড়ে কবি নজরুল বললেন,–তুমি চলো আমার সাথে কোলকাতায়। তোমার গান গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করাবার ব্যবস্থা করিয়ে দেবো।

—এখন নয় কাজীদা। সামনে বি, এ পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষে যাবো কোলকাতায়।

বি, এ পরীক্ষার কথা শুনে নজরুল আর আপত্তি করলেন না। বললেন,–মুসলমান ঘরের ছেলেদের বি, এ পাশ করাটা খুবই জরুরী। তুমি পরীক্ষা শেষে কোলকাতায় এসে অবশ্যই দেখা করবে আমার সাথে।

—আমার কণ্ঠ কি পছন্দ হবে কোম্পানীর ?

—সে দায়িত্ব আমার। তোমার কণ্ঠ যে কতো মিষ্টি তা রেকর্ড বাজিয়ে নিজ কানে না শুনলে বুঝতে পারবে না। তোমার নিজের চেহারা যেমন আয়না ছাড়া নিজে দেখতে পাও না, তেমনি তোমার গলার সুরও কতো মিষ্টি তুমি নিজে বুঝতে পারবে না। এর জন্য চাই রেকর্ডের মাধ্যমে কণ্ঠ শোনা।

নজরুল দুই দিন রইলেন কুচবিহারে। এই দুই দিনে গানে গানে তিনি এক উন্মাদনা সৃষ্টি করে গেলেন সারা কুচবিহার রাজ্যে। আব্বাস আর ক্লাসের বইয়ে মন বেঁধে রাখতে পারেন না। নজরুল সুরের যে কাকলি ছড়িয়ে গেলেন আব্বাসের মনে তাই নাড়া দিতে লাগলো ক্ষণে ক্ষণে। নজরুলের গান শেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন তিনি।

এই সময়ে বায়ু পরিবর্তনের জন্য কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে আব্বাস বেড়াতে গেলেন দার্জিলিং। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর দার্জিলিং। বছরে একবার আব্বাস দার্জিলিং যাবেনই।

এখানে এসে আব্বাস শুনলেন, দার্জিলিং বেড়াতে আসছেন নজরুল। স্থানীয় নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কবি নজরুল একক অনুষ্ঠান করবেন শিল্পী এবং আবৃত্তিকার হিসেবে।

www.pathagar.com

সুযোগ ছাড়া যায় না। কিছুদিন আগে আব্বাসউদ্দীনের সাথে পরিচয় হয়েছে কবির। কবি মোটামুটি মুগ্ধ করে এসেছেন আব্বাসকে। কবির পয়লা নম্বরের ভক্ত হয়েছেন তিনি।

কোন রকমে ঠেলে ঠুলে আব্বাস ঢুকলেন হল ঘরে নির্দিষ্ট দিনে। তিল ধারণের স্থান নেই। ইতোমধ্যে নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে সারা বাংলায় 'বিদ্রোহী কবি' উপাধি পেয়েছেন। একে একে কবিতা আর গান লিখে মাতিয়ে তুলছেন বাংলার যুবকদের।

শ্রোতাদের অনুরোধে নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। আবৃত্তি শেষ হলো। বিপুল করতালি। এবার গান ধরলেন নজরুল। হঠাৎ আব্বাসের চোখ পড়লো স্টেজে বসা এক ভদ্রলোকের দিকে। কুচবিহারে নজরুলের সাথে এই লোকটাও ছিলেন। তখন তার সাথে আব্বাসের বেশ কথাও হয়েছিল। ভদ্রলোক আব্বাসকে দেখেই চিনলেন। ইশারায় স্টেজের কাছাকাছি আসতে বললেন।

পর পর কয়েকটি গান গেয়ে কবি তখন বেশ ক্লান্ত। গলাটাকে চাঙ্গা করার জন্য একটু চা পানের সময় চেয়ে নিলেন। এই অবসরে সেই ভদ্রলোক নজরুলের কানে কানে বললেন,–আব্বাসের কথা কি মনে আছে ? সেই যে কুচবিহারে যার রুমে আপনি ছিলেন। গান শুনে প্রশংসা করেছিলেন।

—আলবৎ মনে আছে কাব্য রত্নাকর সাহেবকে। কেন, কি হয়েছে ?

—সে এই হলের মধ্যেই আছে।

—কই, কোথায় ?

আব্বাস এবার সামনে এসে কবিকে সালাম জানালেন। নজরুল আব্বাসকে হিড় হিড় করে টেনে এনে দাঁড় করালেন মাইকের সামনে। ঘোষণা করলেন,–এক নতুন শিল্পীর সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এর নাম শ্রীমান আব্বাসউদ্দীন। এখন সে আপনাদের গান গেয়ে শোনাবে।

কোনো পূর্ব প্রস্তুতি নেই। তারপর পোশাক পরিচ্ছদও অবিন্যস্ত। ভারি বিপদে পড়লেন আব্বাস উদ্দীন। কবি দর্শকদের সাথে আব্বাসের পবিচয় করিয়ে দিয়ে আবার চা পানে মগ্ন।

হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে আব্বাস কবির দিকে তাকালেন। বললেন,–আপনার গান দিয়েই শুরু করি। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন কবি।

আব্বাস ধরলেন 'ঘোর ঘোররে আমার সাধের চরকা ঘোর'। এক গানেই আসর মাত। তখন স্বদেশীর যুগ। চরকায় সুতা কাটার, কাপড় বোনার ধুম পড়েছে গ্রামে গঞ্জে। নজরুলের এই গানটি তাতে উদ্দীপনা জাগিয়েছে।

www.pathagar.com

আব্বাসের গলার অপূর্ব কারুকাজে ভিন্ন স্বাদের এই গানটি শুনে দর্শকরা আরো একটি গাইবার জন্য অনুরোধ জানালো।

ইতোপূর্বে দার্জিলিং এসে আব্বাস নেপালী ভাষায় একটা গান শিখেছিলেন। এবার ধরলেন সেই গানটি–

আজুরে ষাঁউ ষাঁউ ভলিরে ষাঁউ ষাঁউ
পরশি তো ষাঁউ খায়লা লাইবরিয়া ষাঁউ ষাঁউ।

হলে বহু নেপালী শ্রোতার উপস্থিতি দেখেই আব্বাসউদ্দীন এই গান ধরলেন। আব্বাসের সাথে সাথে নেপালী শ্রোতারাও সুর তুললো। হল ঘরটি যেন ভেঙ্গে পড়তে চাইলো হাজারো কণ্ঠের প্রতিধ্বনিতে।

আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। কিন্তু শ্রোতাদের হৃদয় জয় করে নিলেন আব্বাসউদ্দীন। দু'খানা গান গেয়ে আব্বাসউদ্দীন হয়ে পড়লেন দার্জিলিং এর শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

এতো বড় জন সমাবেশে আব্বাসউদ্দীন ইতোপূর্বে গান গাইবার সুযোগ পাননি। একসাথে হল ভর্তি সমঝদার শ্রোতার হৃদয় জয় করা অকল্পনীয় ব্যাপার। তাছাড়া অনুষ্ঠান শেষে নজরুল তার পিঠ চাপড়ে বললেন,– তোমাকে আগেই বলেছি কোলকাতায় আসতে। আজ দেখলে তো তোমার কণ্ঠের সম্ভাবনা। দেরি করো না। কোলকাতায় এসো। বি,এ পরীক্ষার আগে দুইটা গান রেকর্ড করাবার ব্যবস্থা করো।

কুচবিহার ফিরে এলেন আব্বাসউদ্দীন। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেলো তার। সুযোগ খুঁজতে লাগলেন কোলকাতায় যাবার।

অপ্রত্যাশিতভাবে সুযোগ এসে গেলো একটা। বন্ধু শীতলের বিয়ে ঠিক হয়েছে কোলকাতায়। বরযাত্রী হিসেবে আব্বাসকে যেতে হবে, শীতল আর কোনো কথা শুনতে চান না। পিতা শুনে কিন্তু রাজী হতে চাইলেন না। কেননা আব্বাস একবার ঘরের বাইরে গেলে আর সহজে ফিরতে চান না।দেশভ্রমণ তার নেশা। সামনে বি, এ পরীক্ষা। এখন কোলকাতায় গেলে পড়াশুনায় বিঘ্ন ঘটবে।

কোলকাতা পৌঁছে আব্বাস সোজা চলে গেলেন গ্রামোফোন কোম্পানীর অফিসে। বিমল দাস গুপ্ত নামে একজন কুচবিহারের লোক এখানে কাজ করেন। তার পিতা ছিলেন আব্বাসের স্কুল জীবনের শিক্ষক। বিমল বাবুর সাথে আব্বাসের পরিচয় ছিল আগেই। তার কাছে বললেন তার গান গাওয়ার কথা, নজরুলের তারিফের কথা। বিমল বাবুর কাছে জানতে পারলেন, নজরুল কোলকাতার বাইরে আছেন। শেষে বিমল বাবু বললেন,–গাও দেখি একখানা গান।

www.pathagar.com

স্বর্গ হাতে পেলেন আব্বাসউদ্দীন। কাজী নজরুল ইসলামের গানই তার অনুপ্রেরণা। তাই কবির সেই বিখ্যাত গান 'কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট' গানটি গেয়ে শোনালেন।

আব্বাসের কণ্ঠ পছন্দ হলো বিমল দাস গুপ্তের। তিনি বললেন,–তুমি নতুন শিল্পী। তোমার গান আমি রেকর্ড করানোর ব্যবস্থা করবো। কিন্তু একটু সময় লাগবে। তোমার ঠিকানা রেখে যাও। আমি যোগাযোগ করবো তোমার সাথে।

—কুচবিহার ফিরে আমি আবার কার্সিয়াং বেড়াতে যাবো।

—ঠিক আছে, সেখানকার ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখো।

মোটামুটি একটা আশার বাণী নিয়ে আব্বাস ফিরে এলেন কুচবিহারে। তারপর বেড়াতে গেলেন কার্সিয়াং বন্ধু মোশারফের সাথে। সেখানে পৌঁছে চিঠি লিখলেন তিনি বিমল বাবুর কাছে।

এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব এলো। বিমল বাবু লিখলেন,–তাড়াতাড়ি চলে এসো কোলকাতায়। তোমার গান রেকর্ড করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চিঠি নয়, যেন স্বপ্নের রাজ্যে ঢুকবার ছাড়পত্র পেলেন আব্বাস। চিঠিটা দেখালেন বন্ধু মোশারফ হোসেনকে। বন্ধুটি সঙ্গে সঙ্গে একশত টাকা বের করে বললেন,–কাল সকালেই রওনা হয়ে যাও। ওখানে পৌঁছে যদি আরো টাকার দরকার হয়, লিখো।

কোলকাতায় পৌঁছে আব্বাস সোজা যেয়ে উঠলেন গ্রামোফোন কোম্পানীর অফিসে। বিমল দাস গুপ্ত আব্বাসের অপেক্ষাতে ছিলেন। দুইটা গান তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছেন। রেকর্ডের একপিঠে হবে শৈলেন রায়ের রচনা 'স্মরণ পারের ওগো প্রিয়' গানখানি। অন্য পিঠে হবে 'কোন বিরহীর নয়ন জলে বাদল ঝরে গো'। গান দু'টির সুর সংযোগও করা হয়েছে। আব্বাস তখনই লেগে গেলেন সুর রপ্ত করতে, কণ্ঠে তা উঠিয়ে নিতে। ঠিক হলো, আগামীকাল গান রেকর্ড হবে। গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডিং স্টুডিও বেলেঘাটায়। যেতে হবে সেখানে।

রাতে আব্বাসের আর ঘুম হলো না উত্তেজনায়। এক নতুন জীবনে পদার্পণ করতে যাচ্ছেন তিনি। পরদিন এতো ভোরে বেলেঘাটায় পৌঁছলেন যে, দারোয়ানকে উঠাতে হলো ঘুম থেকে।

স্টুডিওতে এসে পরিচিত হলেন তিনি কে, মল্লিকের সাথে। একজন বিখ্যাত গায়ক হিসেবে কে, মল্লিকের নাম আব্বাস আগে বেশ শুনেছেন। তিনি যে এই কোম্পানীতে রেকর্ডিং এর দায়িত্বে আছেন আব্বাসের তা জানা ছিল না। তিনি

www.pathagar.com

বেশ আন্তরিকতার সাথে আব্বাসকে গ্রহণ করলেন। বি, এ পরীক্ষার্থী শুনে খুশি হলেন আরো বেশি।

ইতোমধ্যে এসে গেলেন বিমল দাস গুপ্ত। কে, মল্লিকের সাথে তার কথা হলো গান নিয়ে। কে, মল্লিক এবার শুনতে চাইলেন গান দুইটি।

জড়তা দূর করে আব্বাস হারমোনিয়াম ধরলেন। তিনি বুঝে নিয়েছেন কে, মল্লিককে সন্তুষ্ট করতে না পারলে সব আশা বিফলে যাবে। তাই মন-প্রাণ ঢেলে গাইলেন গান দু'টি।

গান শুনে 'চমৎকার গলা' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন কে, মল্লিক। কিন্তু বিমল বাবুকে বললেন,–আজ তো এর রেকর্ড হতে পারে না।

আকাশ থেকে পড়লেন আব্বাসউদ্দীন। এতো সাধ করে, এতো কাঠ-খড় পুড়িয়ে এতোদূরে এসেছেন। এখন কিনা বলছেন, রেকর্ড করানো যাবে না। তা হলে 'চমৎকার গলা' বলার কি দরকার ছিল ?

—কেন, কি হয়েছে ? রেকর্ড করানোতে অসুবিধা কোথায় ? বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন বিমল বাবু।

—একেতো নতুন আর্টিস্ট, তাতে আবার মুসলমান। দেখুন না গানের উচ্চারণ। আঞ্চলিক উচ্চারণ এসে গেলে শ্রোতারা গান পছন্দ করবেন না।

—কি করতে হবে তা হলে ? উচ্চারণ শেখানোর জন্য কি হিন্দু কলেজের পন্ডিতকে আনবো ?

—পন্ডিতের দরকার নেই। আব্বাস সারাদিন থাকুক আমার কাছে। আমি ওর উচ্চারণ পথে আনতে পারবো। রেকর্ড হবে আগামীকাল।

—উদ্ধার করুন আমাকে। ওর গলা শুনে আমিই ওকে এনেছি। দেখুন একটু মেজে ঘসে। বললেন বিমল বাবু।

—মুক্তা ঠিকই আপনি এনেছেন সংগ্রহ করে। এখন ওর দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন।

—তা হবে না ? জাতের টান তো।

আব্বাসকে রেখে বিদায় নিলেন বিমল বাবু। এতোক্ষণ আব্বাস ছিলেন একটা ঘোরের মধ্যে। আশা নিরাশার দোলাচলে দুলছিল তার মন।

আব্বাসকে নিয়ে তখনই বসে গেলেন কে, মল্লিক। দীর্ঘক্ষণ চললো গান দু'টি উচ্চারণ সংশোধনের কাজ। ধীরে ধীরে এই বিখ্যাত শিল্পীর সাথে সম্পর্কটা স্বাভাবিক পর্যায়ে এলো আব্বাসের। এক সময়ে আব্বাসউদ্দীন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,–বিমলদা জাতের টান বললো কেন ?

www.pathagar.com

—তুমিও ভুল করলে। আমি কিন্তু মুসলমান ঘরের ছেলে। আমার নাম কাসেম মল্লিক। মুসলমান ছেলের গাওয়া রাম প্রসাদী গান হিন্দুরা শুনবে না। তাই সংক্ষেপে নিয়েছি কে, মল্লিক নাম।

শিল্পী নিজের মুখে না বললে আকাশ থেকে ফেরেশতা নেমে এসে হলফ করে বললেও আব্বাস বিশ্বাস করতেন না। দ্বিধা তবু যায় না।

—আপনার গান বেশ শুনি। সেই শ্যামা সংগীত 'আর কবে দেখা দিবি মা' 'ওমা অন্তে যেন এ চরণ পাই' এই সব গান।

—তাতে কি ? গান গানই। মুসলমানরা তো গান শোনে না। বাধ্য হয়ে কে, মল্লিক হতে হয়েছে আমাকে।

পরদিন গান দুটো রেকর্ড করা হলো। সব দিক থেকে অযাচিত সাহায্য পেলেন নবীন এই কণ্ঠ শিল্পী। বিদায় নেওয়ার সময় গ্রামোফোন কোম্পানীর বৃদ্ধ ম্যানেজার ভগবতী বাবু আব্বাসকে ডাকলেন। তার হাতে তিনশো টাকা দিয়ে বললেন,—এটা আপনার আসা-যাওয়া ও থাকার খরচ।

আব্বাসের এবার অবাক হবার পালা। গান গেয়ে আবার টাকা পাওয়া যায় জানা ছিল না তার। নবীন কণ্ঠ শিল্পীর গান শ্রোতাদের কাছে পৌঁছনোর দায়িত্ব কোম্পানী নিয়েছে, এটাই যথেষ্ট। তারপর টাকা ?

—আমাদের ইচ্ছা, আপনি আরো কিছুদিন কোলকাতায় থেকে যান। অন্তত আরো আটখানা গান আমরা রেকর্ড করিয়ে নেবো।

ভগবতী বাবুর এই অযাচিত প্রস্তাবে আব্বাস বেশ খুশি হলেন। বুঝলেন, তার কণ্ঠ পছন্দ হয়েছে ঝানু ম্যানেজারের। তিনি রাজী হতে যাবেন। এমনি সময়ে বিমল বাবু বললেন,—না, এখন থাক। ছেলেমানুষ এসেছে কার্সিয়াং থেকে। ওখানে ফিরে বায়ু পরিবর্তন করে স্বাস্থ্যটা ভালো করে নিক। তারপর দেখা যাবে।

পথে এসে আব্বাস বিমল বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন,—দাদা, বেশ তো হতো। আরো ৮টা গান আসতো বাজারে। আপনি বাধা দিলেন কেন ?

—তুমি এখনো ছেলেমানুষ। এই লাইনে নতুন। ঝানু ভগবতী বাবুর পরিকল্পনা তুমি বুঝবে না। আরো ৮খানা গান দিলেও ওই তিনশো টাকা দিয়েই বিদেয় করা হতো তোমাকে।

—আমার টাকার দরকার নেই। গান বাজারে আসুক। পরিচিতিটা আসল।

—টাকার দরকার নেই, ভালো কথা। কণ্ঠকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার না করাই উত্তম। কিন্তু সমস্যা হলো, ৮টি গান একবার রেকর্ড করাতে পারলে কোম্পানী দু'বছরের মধ্যে তোমাকে আর ডাকবে না। এই সময়ে তারা ঐ

www.pathagar.com

গানগুলি বাজারে ছাড়বে। হাজার হাজার রেকর্ড বিক্রি করে কোম্পানী ফেঁপে উঠবে। তোমাকে ডাকার প্রয়োজনই মনে করবে না তারা।

আব্বাস এবার বুঝতে পারলেন ভগবতী বাবুর প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ার কারণ। শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো তার বিমল বাবুর প্রতি।

কোলকাতা থেকে আবার কার্সিয়াং। কিছুদিন সেখানে থেকে আব্বাস আবার ফিরে এলেন কুচবিহারে। বন্ধুদের বললেন তার গান রেকর্ডিং এর কাহিনী। তিনশো টাকা যে পেয়েছেন সে কথাও বলতে ভুললেন না।

দিন যায়। আব্বাস অপেক্ষায় আছেন রেকর্ডে তার গান শোনার জন্য। কিন্তু কোনো খবর নেই। এদিকে বন্ধুরাও বিরক্ত করে ছাড়ছে। কেউ কেউ তো উপহাসই করা শুরু করলো। ভাবলো, দাম বাড়াবার জন্য আব্বাস এমন গল্প ফেঁদেছেন। শেষে অবস্থা এমন হলো, বাইরে এলে ছেলেরা তাকে দেখিয়ে বলতে লাগলো, ঐ যে রেকর্ড গাইয়ে আসছে।

বি, এ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অন্য দিকে মনোনিবেশ করার সুযোগ পেলেন না আব্বাসউদ্দীন। সময় ব্যয় করে কোলকাতায়ও গেলেন না খোঁজ নিতে।

অবশেষে শুরু হলো বি, এ পরীক্ষা। প্রস্তুতি ভালোই হয়েছে তার। পরীক্ষাও শেষ করলেন সুন্দরভাবে। বাবার আকাঙ্খা পুরন করা সম্ভব হবে।

পরীক্ষা শেষ হবার অপেক্ষাতে ছিলেন বন্ধু আবুল হোসেন। আব্বাসকে নিয়ে গেলেন তার গ্রামের বাড়ি রংপুরের বড়খাতায়। বন্ধুদের বিদ্রুপ শুনতে শুনতে আব্বাসও হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। তাই আর অমত করলেন না যেতে। তারপর বড় খাতায় যেয়ে কি যে ঘটেছিল তা প্রথমেই জানতে পেরেছ তোমরা।

বি, এ পাশ আর হলো না। পিতাকে আল্লাহ ফিরিয়ে দিয়েছেন এতেই আব্বাস খুশি। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। ফুটবল খেলে, মাছ ধরে, গান বাজনা করে সময় কাটান। একদিন ঝাপই নদীতে জাল নিয়ে গেছেন মাছ ধরতে। মাছ ধরার নেশায় অনেক দূর যে এসেছেন, খেয়াল নেই। হঠাৎ মিষ্টি একটা কণ্ঠ কানে এলো তার। কোথাও গান গাইছে কেউ। ধীরে ধীরে গানের সুর আরো স্পষ্ট হলো। এতো মিষ্টি গলা আব্বাস আগে শোনেননি। দেখলেন, মহিষের পিঠে চড়ে একটা ছেলে এদিকে আসছে। মহিষ যতো কালো তার চেয়ে আরো কালো তার বাহন ছেলেটি। আব্বাসকে দেখে গান বন্ধ করলো ছেলেটি।

অভিভূত হয়ে, আব্বাস গেলেন ছেলেটির কাছে। বললেন,–ভাই গানটি আরো একবার গাও। আমি তুলে নেই আমার কণ্ঠে।

—আমি গান গাই না।

www.pathagar.com

—এই যে আমি শুনলাম। আমিও গান গাই। তোমাকে অনেক গান শোনাবো। তোমার ঐ গানটা শুধু শোনাও আমাকে।

ছেলেটিকে কিছুতেই রাজী করানো গেলো না গান শোনাতে। আব্বাস তাকে তামাক খাওয়ানোর প্রলোভন দেখালেন। তাতেও রাজী হলো না ছেলেটি। অপূর্ব মধুময় কণ্ঠে গান শোনা হলো না আব্বাসের।

পরীক্ষায় পাশ হয়নি। রেকর্ডে যে গান দিয়েছেন তাও বাজারে আসছে না। বেশ মনঃকষ্টের মধ্যে আছেন আব্বাসউদ্দীন। শহরে এসে খোঁজ নিবেন সে উৎসাহ ফেলেছেন হারিয়ে।

বাড়ি থেকে পাঁচ মাইল দূরে কৃষ্ণপুর গ্রামে হাটের ইজারা রয়েছে আব্বাসউদ্দীনের পিতার। এই হাটের তহসিল আদায়ের দায়িত্ব নিলেন আব্বাস উদ্দীন। সপ্তাহে দুই দিন যেতে হয় তাকে সেখানে। সবচেয়ে কষ্ট হয় গরমের দিনে। ভর দুপুরে হাটের পথে বের হতে হয় তাকে। পায়ে হেঁটে ছাড়া সেখানে পৌঁছনোর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তহসিল আদায় করতে করতে কখনো রাত এগারোটা বেজে যায়। শেষ হাটুরের অপেক্ষায় থাকতে হয় তাকে। পথে আবার কালজানি নদী। খেয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় পাটনির। খেয়া ওপারে থাকলে এপারে আসতে সময় লাগে অনেক। এই সময় নদীর পাড়ে বসে সারা দিনের ক্লান্তি দূর করার জন্য আব্বাস গান ধরেন মিষ্টি সুরে। নদীর পাড়ে তা প্রতিধ্বনি তোলে।

কৃষ্ণপুর হাটে দোকান রয়েছে রামরতন ঠাকুরের। এই ঠাকুরের বাড়ি বলরামপুরে। হাটের দিনে তার সাথেই ফেরেন আব্বাসউদ্দীন। নদীর পাড়ে গভীর রাতে আব্বাসের কণ্ঠে গান শুনে তিনি বলেন,–তোমার এমন মিষ্টি গলা। তারপর লেখাপড়া শিখেছো। তোমার কি এই তহসিল আদায়ের কাজ মানায় ?

—কি করবো ঠাকুর। বি, এ পাশ হলো না বলে কুচবিহারেও যেতে পারি না।

—তুমি কোলকাতা চলে যাও। গান দাও কলের গানে। কতো নাম হবে। কতো টাকা পয়সা হবে।

—কলের গানে দুইটা গান দিয়েছি। বাজারে তা এলো না। সবাই ভাবছে, আমি বুঝি মিথ্যে বলেছি।

—আমি বিশ্বাস করি তোমার কথা। বাবাকে তুমি হয়তো রাজী করাতে পারবে না। ছাড়তে চাইবেন না তিনি তোমাকে। তবে এইভাবে গ্রামে পড়ে থাকাও তোমার উচিত হচ্ছে না।

www.pathagar.com

আব্বাস বুঝলেন, ঠাকুর ঠিক কথাই বলেছেন। প্রতিষ্ঠা পেতে হলে কোলকাতা তাকে একদিন না একদিন যেতেই হবে। সেখানে কতো লোক কুলি মজুরি করে দিন কাটায়। তার পেটে কিছু বিদ্যা তো আছে। কণ্ঠ আছে। কোন কাজ কি জুটিয়ে নেওয়া যাবে না ?

আব্বাস সিদ্ধান্ত নিলেন, কোলকাতায় তাকে যেতে হবে। গ্রামের মায়া ছাড়তে হবে। তৈরি হতে লাগলেন তিনি সেইভাবে।

এর মধ্যে কুচবিহার শহর থেকে এলো একটা চিঠি। আব্বাসের এক বন্ধু শশধর বাবু লিখেছেন শহর থেকে। বড় সুসংবাদ বয়ে এনেছে চিঠিটা। আব্বাসের রেকর্ড বের হয়েছে। তাকে শহরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ওই বন্ধুটি।

এই খবরটা পাবার জন্য ছয় মাস ধরে পথ চেয়ে আছেন আব্বাসউদ্দীন। শহরে যাবার পথ তার সুগম হলো। কাউকে কিছু না বলে সোজা এসে হাজির হলেন তিনি বন্ধুর বাসাতে।

এখনকার দিনে যেমন ঘরে ঘরে রেডিও, টেলিভিশন এর মাধ্যমে আমরা মুহূর্তের মধ্যে দেশ বিদেশের খবর জানতে পারছি, ছবি দেখতে পারছি তখনকার দিনে এসব কিছুই ছিল না। টেলিভিশন তখন গবেষণা কক্ষে। গান শুনতে হলে গায়কের উপস্থিতিতেই তা শুনতে হতো। আর একটা উপায় ছিল কলের গান বা গ্রামোফোন যন্ত্র। এখন যেমন অডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে শিল্পীর গানকে বন্দী করে রাখা যায় এবং ক্যাসেট প্লেয়ারের মাধ্যমে তা শোনা যায় তখনকার দিনে এই ব্যবস্থাটাই ছিল কলের গানের মাধ্যমে। থালার মতো দেখতে কালো প্লেটের দুই দিকে দুইটি গান রেকর্ড করা হতো। এই প্লেট বাজানো হতো গ্রামোফোন যন্ত্রের মাধ্যমে। শিল্পীরা তাদের কণ্ঠকে বহু জনের মধ্যে পৌঁছে দেয়া অর্থাৎ শিল্পীদের আত্ম পরিচয়ের একমাত্র মাধ্যম ছিল গ্রামোফোন যন্ত্র। এই যন্ত্রটি দামী ছিল বলে তা শহরের ধনী পরিবারে ছাড়া পাওয়া যেতো না। তবে এক শ্রেণীর লোক কলের গান ভাড়া করে গ্রামে গঞ্জে শুনিয়ে বেড়াতো। গ্রামের মানুষেরা চাঁদা দিয়ে শুনতো এই কলের গান। আব্বাসকে তার গান শোনার জন্য শহরে আসতে হলো এই কারণে।

শহরে এসে আব্বাস সরাসরি উঠলেন বন্ধুর বাসায়। দেখলেন, একটা গ্রামোফোন যন্ত্রের চারপাশে পঁচিশ ত্রিশজন লোক বসে আছে। সবাই আব্বাসের পূর্ব পরিচিত। তিনিও বসে পড়লেন তাদের মধ্যে। রেকর্ড প্লেয়ার বাজিয়ে একে একে চার পাঁচটি গান শোনা হলো। কিন্তু আব্বাসের গান আর হয় না।

www.pathagar.com

অভিমান এসে ভিড় জমালো আব্বাসের মনে। চিঠি লিখে তাকে আনানো হয়েছে গ্রাম থেকে। গ্রামোফোনে গানও চলছে। কিন্তু তার গানের কোনো খবর নেই। ঘটা করে গান শুনছে তারা অন্য শিল্পীর। আব্বাসের ধারণা হলো, নিশ্চয় তাকে অপদস্ত করার জন্য এমনটি করা হয়েছে।

চোখে পানি এলো আব্বাসের। বিরস বদনে আসর থেকে উঠে দরজার দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

—আরে, আব্বাসের রেকর্ডখানা জুড়ে দে। আব্বাসকে উঠে যেতে দেখে বললো এক বন্ধু।

—মাফ করো ভাই। রেকর্ডে আমি গান দেইনি। এতোদিন মিছেই ধাপ্পা দিয়ে এসেছি তোমাদের। দু' চোখে তার টলটল পানি।

এমন সময় ঘর থেকে গ্রামোফোন যন্ত্রের ভিতর দিয়ে আব্বাসের কণ্ঠে বেজে উঠলো —

কোন বিরহীর নয়ন জলে বাদল ঝরে গো।

মুহূর্তে আব্বাসের দেহে বিদ্যুৎ স্পর্শের ঢেউ খেলে গেলো। নিজের কানকেও বিশ্বাস হয় না তার। তিন চার জন বন্ধু এসে আব্বাসকে শুন্যে করে কাঁধে তুলে নিয়ে গেলো ঘরের ভিতর। তারপর শুরু হলো সম্মিলিত আনন্দ উচ্ছাস। 'রেকর্ড গাইয়ের' দুর্লভ মর্যাদা পেলেন তিনি। এখন যেমন ক্রিকেটে কোনো দেশের হয়ে টেস্ট খেলতে পারলে সারা জীবন তিনি 'টেস্ট প্লেয়ার' পদবী ব্যবহারের সম্মান পান তখনকার দিনে রেকর্ডে গান গাইতে পারলে তিনি 'রেকর্ড গাইয়ে' হিসেবে আলাদা মর্যাদা আর সম্মান পেতেন।

আব্বাস চলে এলেন বলরামপুরে। আত্মবিশ্বাস তার বেড়ে গেছে বহুগুণ। একজন শিল্পী হিসেবে তিনি যে প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন এ বিষয়ে হলেন নিশ্চিত। তার কণ্ঠ ভালো না লাগলে রেকর্ড কোম্পানীরা পয়সা খরচ করে রেকর্ড বাজারে ছাড়তো না। তাকেও দিতো না তিনশো টাকা। এখন কিভাবে তিনি কোলকাতা যাবেন সেই ভাবনায় রইলেন বিভোর হয়ে। হাটের ইজারাদারী করে সময় নষ্ট করার অবকাশ আর নেই। বি, এ পাশ তার দ্বারা হবে না। ব্যারিস্টারী তো নয়ই। তার চেয়ে গান গেয়ে তিনি জনপ্রিয়তা পেতে পারেন। লক্ষ মানুষের অন্তরে ঠাঁই করে নিতে পারেন।

www.pathagar.com

তিন

তুফানগঞ্জে কিংবা বলরামপুরে রেকর্ড গাইয়ে হিসেবে আব্বাসউদ্দীনকে নিয়ে হৈ চৈ পড়লেও কোলকাতা থেকে আর ডাক এলো না তার। ভগবতী বাবু কিংবা বিমল বাবু ভুলে গেছেন তাকে।

আব্বাস সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। গ্রামের জমিজমা, হাটের ইজারা আদায়ের নগদ পয়সা কিংবা কালজানী নদীর চরে জ্যোৎস্না রাতে গান গেয়ে বেড়াবার মোহ ত্যাগ করে একদিন সোজা চলে এলেন কোলকাতায়। উঠলেন তার সেই বন্ধু জীতেন মৈত্রের কাছে।

বন্ধুকে আব্বাস খুলে বললেন তার মনের কথা। গান গেয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চান। এর জন্য প্রথমে দরকার কোলকাতায় টিকে থাকার জন্য কিছু করা। ব্যারিস্টারী পড়তে যে সময় ও শ্রম দিতে হতো তা তিনি গানের ক্ষেত্রে দিবেন। বন্ধুটিও আন্তরিকভাবে তাকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন।

ক'দিন পরে বন্ধু জীতেন মৈত্র সুসংবাদ আনলেন। আব্বাসের থাকার আর খাওয়ার আপাতত একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছেন তিনি। কোলকাতার বিখ্যাত আইনজীবী তসকিন আহমদ সাহেবের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে আব্বাসের। বিনিময়ে উকিল সাহেবের দু'তিনটা ছোট ছেলে মেয়েকে পড়াতে হবে।

আব্বাস তাতেই খুশি। বাড়ির সাহায্য ছাড়াই তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চান। পিতা তাকে আবার বি, এ পরীক্ষা দিতে বলছেন। কিন্তু আব্বাস জানেন, তাতে সফলতা আসবে না। পিতার সাথে এই বিষয়ে তার অভিমান।

আব্বাস দেখা করলেন গ্রামোফোন কোম্পানীর ভগবতী বাবুর সাথে। ভগবতী বাবু ব্যবসায়ীক মানুষ। অন্যান্যদের মতো তিনি আব্বাসকে নিয়ে উচ্চসিত হলেন না। তবে আলাপের এক পর্যায়ে আরো দুটো গান রেকর্ড করাবার পক্ষে মতামত দিলেন।

আব্বাসের আনন্দ আর ধরে না। গান গাইবার জন্যই কোলকাতাতে এসেছেন তিনি। ভগবতী বাবুকে যখন রাজী করানো গেছে, দুটো গান তিনি অবশ্যই যোগাড় করবেন। কোম্পানী পয়সা দিক আর না দিক রেকর্ড বের হতে হবে। গায়ক হিসেবে পরিচিতিটা দরকার আগে।

সংবাদটা জীতেন মৈত্রকে দিলেন আগে। বন্ধুটি বললেন,–বাণীসমৃদ্ধ গান হতে হবে। এখন গান লিখে নাম করেছেন শৈলেন রায়। তার সাথে আমার

www.pathagar.com

হৃদ্যতা আছে। চলো তার কাছে যাই। অন্তত একটা গান আদায় করি। উল্টো পিঠের জন্য আমার একটা গান দেওয়া যাবে। আমার গানটা তৈরি আছে।

অভাবিত সহযোগিতা পেলেন আব্বাস। 'কোন বিরহীর নয়ন জলে' গানটি ইতোমধ্যে শৈলেন রায় শুনেছেন। গানটির শিল্পী আব্বাসকে দেখে তার বিশ্বাস হলো না। তিনি ভেবে রেখেছেন, শিল্পী হবেন পরিণত বয়সের একজন তুখোড় ব্যক্তি। গান বাগানোর জন্য এই কলেজ পড়ুয়া ছেলে মিথ্যে বলছে নাতো তাকে?

কি আর করা। এই গানটি আবার তাকে গেয়ে শোনাতে হলো শৈলেন রায়কে। এবারে কিছুটা নরম হলেন শৈলেন রায়। আব্বাসের জন্য একটা গান দিলেন তিনি 'আজি শরতের রূপ দীপালী'। সুরটাও শিখিয়ে দিলেন যত্ন করে। জীতেন মৈত্রের গানটা 'ওলো প্রিয়া নিতি আসি তব দ্বারে মন-ফুল মালা নিয়া' সুরটাও তিনি ধরিয়ে দিলেন। এতোটা সহযোগিতা তিনি এই বিখ্যাত গীতিকারের নিকট হতে পাবেন, আশাই করেননি।

আবার ভগবতী বাবুর কাছে ধরনা দেওয়া। তিনি পাঠালেন কে, মল্লিকের কাছে। নতুন এই শিল্পীর প্রতি কে, মল্লিকের মনোযোগ আগেই পড়েছিল। আব্বাসের গলার কারুকাজ ও গান দুইটির সুরের অভিনত্বে তিনি আকৃষ্ট হলেন। এবারো উচ্চারণ সংশোধনের পর গান দুটি রেকর্ড করা হলো।

আব্বাসকে এবারে আর ছয় মাস অপেক্ষা করতে হলো না। রেকর্ডিং ডিরেক্টর কে, মল্লিকের সুপারিশ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মাস খানেকের মধ্যেই বাজারে এলো গান দু'টি। হু হু করে বিক্রি হয়ে গেলো তা। আব্বাসউদ্দীনকে নামমাত্র সম্মানী কোম্পানী দিলেও তিনি আপত্তি করলেন না। কেননা কোম্পানীকে তার হাতে রাখা চাই।

হাতে ধরাবাঁধা কোনো কাজ নেই। একটাই কাজ–গানের জন্য সময় ব্যয় করা। তালিম নেওয়া।

বন্ধু জীতেনের এক বোন থাকেন কোলকাতাতে। তার বাড়িতে সাপ্তাহিক আসর বসে গানের। বোনের স্বামী প্রধান উদ্যোক্তা। জীতেনের সাথে আব্বাসও একদিন হাজির হলেন সে আসরে।

ঘরোয়া পরিবেশে গান শোনা, গান কণ্ঠে উঠিয়ে নেওয়া বড় ভালো লাগলো আব্বাসের। একজন নিয়মিত সদস্য হয়ে পড়লেন তিনি এই আসরের।

এখানে গান গাইতে এবং শিখতে এসে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলেন আব্বাসউদ্দীন। গানের আসরে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা লোক দরজার কাছে বসে থাকেন। তন্ময় হয়ে লক্ষ্য করেন সবকিছু।

www.pathagar.com

আব্বাস একদিন ধরলেন তাকে। বললেন,–রোজই আপনাকে বসে থাকতে দেখি। গান বাজনা করেন নাকি ?

—আমি এই বাড়ির বাজার সরকার। গান বাজনা পছন্দ করি। আপনারা কে কিভাবে শিখছেন তা একটু দেখি।

—আমাদের সাথে শিখলেই তো পারেন।

— গান বাজনা শেখা সহজ কাজ নয়। এর জন্য সময় দেওয়া চাই। একাগ্রতা চাই। সবচেয়ে বেশি দরকার হলো এই লাইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। শুধু কণ্ঠে মাধুর্য থাকলে চলবে না, নিয়মিত অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। সেই সময় আর সুযোগ করে নিতে হবে।

—আমার গলা কি পছন্দ হয় আপনার ?

—খুবই। উপরের কথাগুলো আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলা। আপনি বড় কোনো ওস্তাদের কাছে তালিম নিন। সুর সাধনা করুন। সুরের দেবী আপনার কণ্ঠে ধরা দেবার জন্যই বসে আছেন।

—কোলকাতায় নতুন এসেছি। সমঝদার কোনো ওস্তাদের সাথে পরিচয় নেই। আপনি কি দু'একজনের নাম বলবেন ?

—ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁর কাছে যাবেন ঠুংরী শেখার জন্য। এই লাইনে তিনি অদ্বিতীয়। আর তবলার জাদুকর হলেন আজিম খাঁ। ওস্তাদ এনায়েত খাঁ সেতার বাজান অপূর্ব। আর ছোট খাঁর সারেংগী বাজানোর কোনো তুলনাই হয় না।

বাসায় বাজার করে দেয় তার মুখে এতোগুলো ওস্তাদের নাম শুনে অবাক হয়ে গেলেন আব্বাসউদ্দীন। বুঝলেন, ইনি শুধু বাজার সরকার নন। এর ভেতরে আরো কিছু কিন্তু আছে।

অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে আব্বাস দৃষ্টি রাখতে শুরু করলেন বাজার সরকার নাকু ঠাকুরের উপর। ঠাকুরও বুঝলেন ব্যাপারটা। আব্বাসের হাত এড়াতে না পেরে একদিন খুলে বললেন তার আসল কথা। বাজার করা তার পেশা নয়। একসঙ্গে অনেক শিল্পীকে এই বাড়িতে পাওয়া যায় বলেই তিনি বাজার সরকারের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি নিজেও একজন শিল্পী, সুর আরোপকারী। এক গুরুর গৃহে সারারাত উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাধনা করেন। তার আসল পরিচয় তিনি ওস্তাদ শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী।

নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো আব্বাসউদ্দীনের। সংগীতের জন্য একেক জন কতো ভাবেই না সাধনা করছেন। গ্রামোফোন কোম্পানীতে চারটা গান গেয়ে নিজেকে বড় শিল্পী ভাবছিলেন এতোদিন। সংগীতের সিংহাসন থেকে

www.pathagar.com

নেমে এলেন তিনি ধূলাতে। বুঝলেন, প্রতিষ্ঠা পেতে হলে, গান গেয়ে মানুষের হৃদয় জয় করতে হলে সাধনা চাই। কঠোর সাধনা। নাকু ঠাকুর চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা তাকে দেখিয়ে দিলেন।

আব্বাস দেখলেন, গানের পিছনে দৌড়াতে হলে হাত খরচের জন্য কিছু পয়সা চাই। ধরাবাঁধা একটা চাকরি নিলে মন্দ হতো না। খবর পেলেন ডি, পি, আই অফিসে শফিকুল ইসলাম নামে একজন চাকরি করেন। তার গ্রামের বাড়ি আব্বাসের পাশের জেলা জলপাইগুড়িতে। তিনি ডি, পি, আই এর ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করেন। তার কাছে হয়তো উপকার পাওয়া যেতে পারে।

একদিন আব্বাস দেখা করলেন শফিকুল ইসলামের সাথে। খুলে বললেন তার মনের কথা। প্রথম বিভাগে মেট্রিক ও আই, এ পাশ শুনে তখনই তাকে নিয়ে গেলেন সাহেবের কাছে। অপিসে একটা পোস্ট খালি ছিল। আব্বাসকে নিয়োগ করা হলো সেই পদে। মাসিক বেতন পাঁচচল্লিশ টাকা।

এবার আর আব্বাসকে পায় কে ? থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আগেই হয়েছে। হাত খরচের টাকাও যোগাড় হয়ে গেলো। এখন শুধু গানের পেছনে লেগে থাকা।

সুযোগ যখন আসে চারদিক দিয়েই আসতে থাকে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ছাত্ররা একটা বড় গানের জলসার আয়োজন করেছে। বন্ধু জীতেন এসে বললেন,–আজ একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরবি। ঐ গানের জলসায় গান গাইতে হবে তোকে।

—ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ? শ্রোতারা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝদার ছাত্র। কেরানীর চাকরি করি। তাদের সামনে গাইবো কি করে ?

—রাখ তোর কেরানী। তোর তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কথা ছিল। তোর গায়ে কি কেরানী লেখা আছে ? আর সেখানে গান গাইবেন সব বিখ্যাত শিল্পীরা।

—কে কে গান গাইবেন ?

— গান গাইবেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, কে.মল্লিক, পঙ্কজ মল্লিক আর তুই। হ্যান্ডবিলে কিন্তু আমার পীড়াপীড়িতে তোর নাম ছাপা হয়ে গেছে। আমাকে ডুবাস না। তুই আমার গান গেয়ে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিস। এবার তোকে আমি পরিচিত করবো সুধি মহলে।

এই সব বিখ্যাত শিল্পীর সাথে গাইতে হবে শুনে আব্বাসউদ্দীন ঘাবড়ে গেলেন। বললেন,–এতো বড় বড় ওস্তাদ শিল্পীর সাথে আমি আর কি গান গাইবো। আমাকে মাফ করিস ভাই।

www.pathagar.com

— সে কথা আগেই তোকে বলেছি। প্রতিষ্ঠা পেতে হলে সাহস নিয়ে এগুতে হবে। ঘরে বসে থাকলে কেউ তোকে পুছবে না।

—আমি নতুন শিল্পী। তারপর এসেছি গ্রাম থেকে। পাত্তা পাবো কি ওদের সামনে ?

— ঠিক আছে তোকে গাইতে হবে না। সামনা সামনি বসে ওদের গান শুনতে পাবি। সেটা বা কম কিসে ? সন্ধ্যার আগেই তোকে ইনস্টিটিউটের সামনে দেখতে চাই।

অফিস থেকে একটু আগে বের হলেন আব্বাসউদ্দীন। অভিজাত সমাজে চলার মতো পোশাক এখনো তিনি বানাতে পারেননি। যা রয়েছে একটু গোছগাছ করে সন্ধ্যায় হাজির হলেন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। দেখলেন লোকে লোকারণ্য।

আব্বাসের অপেক্ষাতে ছিলেন জীতেন মৈত্র। হাত ধরে তাকে নিয়ে গেলেন স্টেজের কাছে। বসালেন কে, মল্লিকের পাশে।

সন্ধ্যা সাতটায় পর্দা উঠলো। কৃষ্ণচন্দ্র দে গাইলেন পর পর তিনটি গান। তার দরাজ এবং মধুময় কণ্ঠ শুনে অভিভূত হলেন আব্বাসউদ্দীন। এমন গাইয়ে কবে তিনি হতে পারবেন ? তারপর উঠলেন কে, মল্লিক। কিন্তু সুবিধা করতে পারলেন না। এর পরে আরো দুইজন গাইলেন। দর্শকরা কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলো না তাদের গান শুনে। হলের মধ্যে বেশ কথাবার্তা শোনা যেতে লাগলো।

দর্শকদের থামাবার জন্য এক ভদ্রলোক মাইকে ঘোষণা করে দিলেন,– এবারে আপনাদের গান গেয়ে শোনাবেন নবাগত শিল্পী আব্বাসউদ্দীন।

আব্বাসের বুক কাঁপছে ভয়ে। হলঘরে উপচানো দর্শক। তারপর তারা অশান্ত। গান শুনিয়ে এই অশান্ত শ্রোতামন্ডলীকে শান্ত করা সোজা কাজ নয়। বিখ্যাত গায়করা হয়েছেন ব্যর্থ। সেখানে তিনি এক নবীন শিল্পী। নাম ঘোষণা হয়েছে, বসেও থাকতে পারছেন না।

আল্লাহকে স্মরণ করে আব্বাস টেনে নিলেন হারমোনিয়াম। তার চেহারা খারাপ নয়। তারপর মুসলমান ঘরের ছেলে। এইসব বিবেচনায় হয়তো দর্শকরা একটু শান্ত হলো। এই সুযোগটা কাজে লাগালেন আব্বাসউদ্দীন। ইতোমধ্যে রেকর্ডের মাধ্যমে তার যে গানটি শ্রোতাদের কানে পৌঁছে গেছে ধরলেন সেই গানটি 'আজ শরতের রূপ দীপালি'।

গান শেষ হতেই চারদিক হতে বিপুল করতালি। হল ঘর ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। আব্বাস ভাবলেন, গান বুঝি পছন্দ হয়নি শ্রোতাদের। হাততালি দিচ্ছে

www.pathagar.com

মঞ্চ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য। মনটা খারাপ হয়ে গেলো তার। বিরস বদনে হারমোনিয়ামটা সবে বন্ধ করেছেন, অমনি চারদিক থেকে আওয়াজ উঠলো 'আরো একখানা, আরো একখানা'। ভুল ভাঙলো আব্বাসউদ্দীনের। প্রাণে এলো নতুন জোয়ার। শ্রোতারা ভালোভাবেই নিয়েছে তাকে। তাই এবার দরাজ গলায় ধরলেন 'কোন বিরহীর নয়ন জলে বাদল ঝরে গো'।

গান শেষ হতেই আবার সেই একই চিৎকার। আর একখানা, আর একখানা। কিন্তু আব্বাস আর সাহস করলেন না। আরো শিল্পীরা অপেক্ষায় আছেন গান শোনাবার। নবাগত শিল্পী হিসেবে দুইখানার বেশি গান গাইতে পারবেন না আয়োজকদের এমনই নির্দেশ রয়েছে আগে। পর্দাও পড়লো সেইভাবে।

এক আসরেই বাজীমাৎ। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্ররা দলে দলে এসে পরিচিত হতে লাগলো আব্বাসের সাথে। মুসলমান ছাত্রের সংখ্যাই বেশি। এতোদিন তারা মুসলমান শিল্পীর দেখা কম পেয়েছে। গান শোনাবার মতো শিল্পী তাদেরও আছে-এই গর্বে আজ তারা উদ্বেলিত। পঞ্চাশ ষাট জন ছাত্রকে ঠিকানা দিতে হলো আব্বাসের।

বন্ধু জীতেন মৈত্র খুশি হলেন আরো বেশি। আব্বাস তার মুখরক্ষা করেছেন। অশান্ত দর্শকদের গান শুনিয়ে শান্ত করতে পেরেছেন। আব্বাসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

এরপর শুরু হলো দাওয়াতের জোয়ার। কোলকাতার শ্রোতারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে লাগলো আব্বাসউদ্দীনকে। প্রেসিডেন্সি কলেজ, ওন হোস্টেল, বেকার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল, স্কটিশ চার্চ ইত্যাদি থেকে আসতে লাগলো আমন্ত্রণ। গান শোনাবার জন্য যেতে হলো হুগলী, হাওড়া, রানীগঞ্জ, শ্যামবাজার, টালিগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে। শেষের দিকে এতো বেশি দাওয়াত আসতে লাগলো যে আব্বাস বাধ্য হয়ে তার গানের জন্য পারিশ্রমিক ধার্য করলেন। কিন্তু তাতেও রেহাই নেই। দাওয়াতের জোয়ার কমলো না একটুও। এতে আব্বাসের লাভই হলো। টাকা পেলেন, সেই সাথে পেলেন সম্মান। পরিচিতিটাও বাড়তে লাগলো।

পার্ক সার্কাসের রাস্তা পার হচ্ছেন আব্বাস একদিন। সুন্দর চেহারার এক যুবক এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

—কিছু মনে করবেন না। আপনি কি আব্বাসউদ্দীন ? জিজ্ঞাসা করলো যুবকটি।

—ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

www.pathagar.com

—আমি তো নামকরা গায়ক নই যে আমাকে চিনবেন। আমি থাকি এই পাশের বাসায়। আপনার গান শুনেছি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। সেই থেকে আপনার পয়লা নম্বরের ভক্ত।

—আপনার আদি বাস কি কোলকাতায় ?

—মোটেই নয়। আমি পূর্ব বাংলার মুসলমান। একটু আসবেন কি আমার বাসাতে ?

যুবকের আহ্বান আব্বাস আর ফেলতে পারলেন না। চললেন তার সাথে। বাড়িটাতে ঢুকে দেখলেন দরজায় নাম লেখা 'ডঃ কুদরত-ই-খুদা'।

—এই বাসা কি ডক্টর সাহেবের ? শিক্ষাবিদ হিসেবে তার অনেক নাম শুনেছি।

—হ্যাঁ, তিনি দোতালায় থাকেন। আমি থাকি নিচতলায়।

ঘরে ঢুকে আব্বাস বিস্মিত হলেন। বসবেন এমন জায়গা নেই। একটা তক্তাপোষ আছে শুধু একপাশে। আব্বাস যেয়ে বসলেন তার উপর। সমস্ত ঘরে ছবি টাঙানো। কোনো কোনো ছবিতে আবার রং তুলির কাজ চলছে। আব্বাস বুঝলেন, একজন শিল্পীর ঘরে ঢুকেছেন তিনি। তাই আগ্রহের সাথে বললেন,– আমার পরিচয়টা পেয়েছেন। এবার আপনারটা বলুন।

—দেওয়ার মতো কোনো পরিচয় আমার নেই। ছবি আঁকি। নাম জয়নুল আবেদীন।

নামটা শুনে আব্বাস তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। নবীন এই শিল্পীর দুর্ভিক্ষের উপর আঁকা ছবি তিনি দেখেছেন। শিল্পীর সাথে পরিচিত হওয়ার বাসনাও রয়েছে তার। আজ এই অপ্রত্যাশিতভাবে পরিচিত হতে পেরে খুশি হলেন তিনি।

—এই ঘরে আপনি একা থাকেন ?

—ঠিক তাই। আগে একটা 'মেস'এ ছিলাম। কিন্তু ভারি কষ্টকর। বিভিন্ন পদের লোকের আগমন ঘটে সেখানে। ছবি আঁকা নিয়ে নানা প্রশ্ন করে। যেন ছবি সম্বন্ধে কতো জ্ঞান রাখে তারা। নিবিষ্ট মনে কাজ করতে দেয় না। তাই আশ্রয় নিয়েছি এখানে।

এই দিকটা ভেবে দেখেননি আব্বাসউদ্দীন। শিল্পীর নিকট হতে বিদায় নেওয়ার পরে তার মনে ভর করলো জায়গীর থাকার চিন্তাটা। যেখানে আছেন তারা যে অযত্ন করে, তা নয়। তবে সকালে আর সন্ধ্যায় বাচ্চাদের পড়াতে হয়। দিনে অফিসের চাকরি তো রয়েছে। সুর সাধনায় সময় দিতে পারছেন না যথেষ্ট পরিমাণে। কোলকাতায় এসেছেন সুর শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে। তার জন্য

www.pathagar.com

দরকার এই লাইনের লোকজনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা। সকাল সন্ধ্যায় বাচ্চা পড়ানোর কাজ করে তা আর হয়ে উঠছে না। এমনকি ব্যস্ততার কারণে দেখা করা হয়নি কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললেন আব্বাসউদ্দীন। জায়গীর থাকা তার কাজ নয়। একটা ভালো গোছের বাসা খুঁজতে হবে তাকে।

বাসা খুঁজতে যেয়ে পড়লেন আরো বিপদে। বিয়ে করেননি। তারপরে মুসলমান ঘরের ছেলে। বাসা ভাড়া দিতে রাজী হয় না কেউ। বাধ্য হয়ে খুঁজতে লাগলেন মেস। একটা পেয়েও গেলেন। বউ বাজার স্ট্রীটে চার তলায়। তসকিন সাহেবের নিকট হতে বিদায় নিলেন। তার ছেলেমেয়েদের বেশ ভালো লেগেছিল তার। তাদের ছেড়ে যেতে মন আনচান করলেও দ্বিতীয় পথ নেই। মায়া বাড়াবার সময় এখন নয়।

মেস এর জীবন ভালোই কাটতে লাগলো আব্বাসের। কোনো বন্ধন নেই। রেওয়াজ করার সময় পাওয়া যায় অফুরন্ত। এখানে পেলেন এনামুল হককে। তখনো তিনি ডক্টর হননি। সবার সাথে বেশ হৃদ্যতা গড়ে উঠলো। মোটামুটি একটা আনন্দঘন পরিবেশে সময় কাটতে লাগলো তার। মেস জীবনের অভিজ্ঞতা আগে তার ছিল না। সারা মাস খুব ভালো খাবার খেলেন। মাস শেষে জনপ্রতি খরচ পড়লো দশ টাকারও কম। আব্বাস ভাবলেন, কি ভুলই না করেছেন। বেতনের টাকায় কুলাবে কি না এই ভেবে মেসে ওঠেননি। জয়নুল আবেদীনের সাথে রাস্তায় পরিচিত হয়ে ভালোই হয়েছে। এতোদিন দুই বেলা ছেলে পড়িয়ে বৃথা সময় নষ্ট করেছেন বলে আফসোস হতে লাগলো তার।

আব্বাস কোলকাতায় এসেছেন কাজী নজরুল ইসলামের অনুপ্রেরণায়। কিন্তু তার সাথে দেখা করা সম্ভব হয়নি অদ্যাবধি। ছাত্র পড়িয়ে, অফিস করে, বিকেলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে, রাতে আবার ছাত্র পড়াতে বসানোর কাজ করে সময় কোথায় তার কবির সাথে দেখা করার ? এবার সে সুযোগ হলো।

আর দেরি করলেন না আব্বাসউদ্দীন। ঠিকানা যোগাড় করে একদিন সোজা যেয়ে উঠলেন কবির বাসায়।

আব্বাসকে দেখেই কবি চিনলেন। বললেন,-এতো দিনে সময় হলো তোমার ? বি, এ পাশ কি হয়েছে ?

— বি, এ পাশের চিন্তা বাদ দিয়েছি। ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছি গানের রাজ্যে। এর মধ্যে একটা চাকরিও নিয়েছি জুটিয়ে।

— ভালোই করেছ। পেটের চিন্তা থাকলে সৃষ্টিশীল কাজ করা যায় না। রেকর্ডে তোমার গান শুনলাম। কিভাবে করলে এগুলো ?

www.pathagar.com

আব্বাস সবিস্তারে বললেন তার গান রেকর্ডিং এর কাহিনী। কে, মল্লিক তাকে যে অযাচিত সাহায্য করেছেন সেকথাও বলতে ভুললেন না।

—রেকর্ডে তোমার গান দুটো শুনে খুবই ভালো লেগেছে।

—আপনি দুটো গান দিন আমাকে গাইবার জন্য।

—তা কি মনে করে দিতে হবে আমাকে ? আমার গান গেয়ে ইন্দুবালা, আঙুরবালা, কানন দেবী, কমলা ঝরিয়া, ধীরেন দাস, কমল দাস গুপ্ত, মৃণাল কান্তি সবাই উঠে গেলো। আর আমার মুসলমান ভাই 'আব্বাস' আজো পড়ে আছে কুচবিহারের মোহে। কোলকাতায় যখন এসেছ আমি তোমাকে উঠিয়ে ছাড়বো। দেখি ব্যারিস্টার বড় না গায়ক বড়।

আব্বাসউদ্দীনের জন্য নজরুল চারটা গান লিখলেন। সুরও শিখিয়ে দিলেন। প্রথম দুইটা গান রেকর্ড করানোর ব্যবস্থা নজরুলই করলেন। মন প্রাণ ঢেলে গান দুটো গাইলেন আব্বাসউদ্দীন-'বেনুকার বনে কাঁদে বাতাস বিধূর' এবং 'অনেক ছিল বলার যদি দু'দিন আগে আসতে'।

নজরুলের গানের প্রচুর কাটতি। বাংলা গানে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন তিনি। শ্রোতারা লুফে নিচ্ছে নজরুলের লেখা গানের রেকর্ড। গ্রামোফোন কোম্পানী হাজার হাজার টাকার ব্যবসা করছে নজরুলের গান বাজারে ছেড়ে। আব্বাসের গাওয়া এই গান দু'টির রেকর্ডও অল্প দিনের মধ্যে বিক্রি হয়ে গেলো। এর পরে আরো দু'টি গান রেকর্ড করা হলো 'গাঙে জোয়ার এলো ফিরে তুমি এলে না' এবং 'বন্ধু আজো মনে রে পড়ে আম কুড়ানো খেলা'। এই গান দু'টিও পেলো অসম্ভব রকম জনপ্রিয়তা।

এই সময়ে আব্বাসের অফিসের এক ভদ্রলোক তাকে ধরলেন গান গাইতে যেতে হবে তাদের গ্রামে। নতুন চাকরি, বন্ধুটিও নতুন। আব্বাস আর না করতে পারলেন না। খঞ্জনপুর গ্রামে জমিদারের একটা খাসমহল আছে। একদিন এই জমিদারের অফিসের কয়েকজন মুসলিম কর্মচারী এসে আব্বাসকে একরকম জোর করেই নিয়ে গেলেন। সাথে অফিসের সেই বন্ধুটি।

সন্ধ্যার দিকে আব্বাস সেখানে পৌঁছে দেখলেন মহা বিপদ। যাত্রা গানের আসরের মতো চারদিকে লোক বসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাঝখানে গায়কের আসন।

আব্বাস জমিদারের ম্যানেজারের খোঁজ নিলেন। দেখা করতে চাইলেন তার সাথে। প্রায় ঘন্টা খানেক পরে এসে দেখা দিলেন তিনি। কোনো ভূমিকা না করেই বললেন,–আপনি আব্বাস সাহেব তো ? কোলকাতা থেকে এসেছেন ? তা গান আরম্ভ করুন গিয়ে।

www.pathagar.com

—কি ভাবে গান গাইবো ? এতো লোক হাজির হবে জেনেও মাইকের ব্যবস্থা করেননি কেন ?

—প্রতিবার এখানে যাত্রা গান হয়। এতো লোক তো কখনো হয় না। আপনি আসবেন বলে হয়তো বা ছোটলোক প্রজা মুসলমানরা এসেছে গান শুনতে, আপনাকে দেখতে।

'ছোট লোক প্রজা মুসলমান' কথাটা আব্বাসের মনে বেশ লাগলো। ম্যানেজার বাবুর সাথে আর কথা বলতে ইচ্ছে হলো না তার। তিনি সোজা চলে গেলেন স্টেজে। জোর গলায় বললেন,–আপনারা শান্ত হোন। আমাকে গান গাইতে দিন।

দশ বারো হাজারের জনতা একেবারে শান্তরূপ ধারণ করলো। নজরুলের গান দিয়েই আব্বাস শুরু করলেন। 'ও ভাই হিন্দু মুসলমান, ভুল পথে চলি দোঁহারে দুজনে কোরো নাকো অপমান'-কিছুদূর গেয়েছেন অমনি আট দশ হাত দূর থেকে ক'জন যুবক চিৎকার করে উঠলো,–কিছু শোনা যাচ্ছে না মশাই জোরে গান। জোরে গান। অন্য দিকে পঞ্চাশ হাত দূর থেকে চিৎকার উঠলো, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি আমরা। আপনি গান চালিয়ে যান ভাই।

সভায় বেশ একটা হট্টগোল লেগে গেলো। হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন আব্বাসউদ্দীন। ঠিক এই সময়ে একজন যুবক এসে আব্বাসকে বললেন,–একটু বাইরে আসুন, ভাই। আপনার সাথে বিশেষ দরকার আছে।

আব্বাস ভাবলেন, গন্ডগোলটা একটু থেমে আসুক। তখন আবার আরম্ভ করা যাবে। এই ভেবে যেই নেমে এসেছেন স্টেজ থেকে অমনি কয়েকজন তরুণ এসে আব্বাসকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করলো। কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না আব্বাসউদ্দীন। এ আবার কি বিপদে পড়লেন। হাত পা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু পরাস্ত হতে হলো তরুণদের কাছে।

প্রায় ঘন্টাখানেক দৌড়ালো তরুণ দল। আব্বাস তাদের কাঁধে। তারপর তারা থামলো একটা নির্জন স্থানে। আব্বাসও মুক্তি পেলেন।

—ব্যাপার কি ? আমাকে কি বলির পাঠা পেয়েছ ? এইভাবে আমাকে হাইজ্যাক করে নিয়ে এলে কেন ?

—ভাই, রাগ করবেন না। আপনার আজ মহা বিপদ। আপনি কেন এসেছেন এখানে ?

—তোমাদের এখানকার কয়েকজন মুসলমান ছেলে গিয়েছিল আমাকে আনতে। কেন, হয়েছেটা কি ?

www.pathagar.com

—ঐ ম্যানেজার বাবু প্রতিবছর এখানে যাত্রা, কীর্তন আর বাইজী নাচের আসর বসায়। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই মুসলমান। তারা এই সব না-জায়েজ কাজে অংশ নেয় না। রেকর্ডের মাধ্যমে তারা আপনার গান শুনেছে। তাই এবারে তারা আপনার গান শোনার দাবী জানিয়েছে। তাতেই ম্যানেজার বাবু নাখোশ।

—নাখোশ হওয়ার কারণ কি ? প্রজাদের ইচ্ছার কি কোন দাম নেই ?

— না নেই। মুসলমান প্রজাদের কথা শুনতে হবে, এতে রাজী হননি তিনি। শেষে দাবীর মুখে নতি স্বীকার করলেও ফন্দি আটেন মনে মনে। একজন মুসলমান এসে গান গাইবে আর তাতে এতো লোক হাজির হবে আদপেই পছন্দ হয়নি তার। তাই কিছু তরুণদের লাগিয়েছে আপনার পিছনে। শুনতে পাচ্ছি না বলে চিৎকার করছিল ওরাই। ওরা হয়তো আপনাকে প্রাণে মেরে ফেলতো।

—এখন আমি ফিরবো কিভাবে কোলকাতায় ?

—একটু পরেই একটা ট্রেন আছে কোলকাতার। তাতে আপনাকে উঠিয়ে দেবো। আর কখনো এমন ভুল করবেন না। সবখানে আমাদের মতো 'রহিমুদ্দীন কলিমুদ্দীন' নাও পেতে পারেন।

কৃতজ্ঞতায় আব্বাসের দু'চোখে পানি এলো।

বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন আব্বাসউদ্দীন। কোলকাতায় ফিরে আল্লাহর দরগাহে হাজার শুকরিয়া আদায় করলেন।

সামান্য কয়েক ঘন্টার ঘটনা। কিন্তু ব্যাপক প্রভাব ফেললো এটি আব্বাসের মনে। তিনি বুঝতে পারলেন, বাংলার মুসলমানরা সংগীত মনস্ক হয়েছে। সুরের মূর্ছনা দোলা দিয়েছে তাদের অন্তরকে। তাইতো আব্বাসের গান শোনার জন্য তারা দাবী জানিয়েছে হিন্দু ম্যানেজারের কাছে। আসরে হাজির হয়েছে দলে দলে। আবার বিপদে শিল্পীকে উদ্ধারও করেছে তারা।

মুসলমানদের এই আগ্রহকে ধরে রাখতে হবে। বিকশিত করতে হবে। মুসলমানদের অনেক গৌরবজনক ইতিহাস আছে। তাদের শৌর্য-বীর্য নিয়ে গান বেঁধে তা মুসলিম শ্রোতাদের শোনাতে পারলে মন্দ হতো না। হিন্দু দেব-দেবীর নিয়ে, পুরানের কাহিনী নিয়ে নজরুল ইতোমধ্যে অনেক গান লিখেছেন, কীর্তন রচনা করেছেন। সেগুলো যখন হিন্দু সমাজে আদৃত হয়েছে, মুসলমানের লেখা বলে অবহেলা করেনি, মুসলমানদের গান নিয়ে কেন যাওয়া যাবে না বাংলার মুসলমানদের ঘরে ? চিন্তাটা দারুণভাবে পেয়ে বসলো আব্বাসের।

www.pathagar.com

যেমন ভাবনা তেমন কাজ। ইতোমধ্যে নজরুলের সাথে তার বেশ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে। সাহস করে কথাটা পাড়লেন তিনি নজরুলের কাছে। বললেন,- মুসলিম সমাজের জন্য কিছু গান লিখুন। আমি কণ্ঠ দিবো সেগুলোতে।

—সর্বনাশ। মুসলমানরা আমাকে 'কাফের' ফতোয়া দিয়েছে। এখন যদি আল্লাহ রসুল নিয়ে গান লিখি, তারা নির্ঘাত মেরে ফেলবে আমাকে।

—কাফের ফতোয়া দিয়েছে উগ্র মৌলভীরা। গ্রামের সাধারণ মুসলমানরা কিন্তু আপনার দারুণ ভক্ত। আপনার লেখা গান শোনার জন্য তারা দু'চার মাইল পথ হেঁটে এসে গাটের পয়সা খরচ করে কলের গানে গান শোনে। মুসলমান কবির গান শুনে নিজেদের গর্বিত ভাবে।

—তাই নাকি ? আমি শুনেছি তারা আমার নাম শুনতে পারে না।

—ঠিক শোনেন নি। অনেকে অবশ্য আপনাকে পছন্দ করে না। কিন্তু তাদের এই অপছন্দের কারণও আপনি নিজে।

—কেমন করে ?

—হিন্দু পুরানের অলীক কাহিনী নিয়ে এতো মাতামাতি করলেন, কিন্তু মুসলমানদের সম্বন্ধে একটা কথাও আজ পর্যন্ত বললেন না। আপনি যে মুসলমান তার পরিচয় কি শুধু বাবরি চুল রেখে আর দোক্তা দিয়ে পান খেয়ে ?

আব্বাসের কথা শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন নজরুল। বললেন,- এটাই আমার দুঃখ, আব্বাস। অনেকেই জানে না আমি কতো বড় মুসলমান। ছোটবেলা মক্তবে পড়েছি। গ্রামের মসজিদে আজান দিয়েছি, ইমামতি করেছি। যুদ্ধে যেয়ে মিসরীয় এবং আরবীয় সুর রপ্ত করেছি। কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারছি না মৌলভীদের ভয়ে।

—এখন চিন্তা কিসের ? আপনি ইসলামী গান লিখুন। কণ্ঠ দিবো আমি। দুইজন মুসলমানের গান শুনলে হয়তো তারা মারতে আসবে না।

—কিন্তু ইসলামী গান রেকর্ড করবে কে ? গ্রামোফোন কেম্পানীর সবাই অমুসলমান। এক কাসেম মল্লিক আছে। ভয়ে সেও কে, মল্লিক নামে 'বাবু' সেজেছে।

—রেকর্ডিং এর দায়িত্ব আমার। নজরুলকে আশ্বাস দিলেন আব্বাস।

গ্রামোফোন কোম্পানীর ভগবতী বাবুই হলেন রেকর্ডিং এর হর্তা-কর্তা। আব্বাস দেখা করলেন তার সাথে। নজরুলকে দিয়ে তিনি কিছু ইসলামী গান লেখাবেন। কণ্ঠ দিবেন তিনি। এই গান রেকর্ডিং এর ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানালেন ভগবতী বাবুকে।

www.pathagar.com

কথাটা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন ভগবতী বাবু। বললেন,-কোম্পানীর সর্বনাশ করার ভালো একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। মুসলমানরা নজরুলকে কাফের ফতোয়া দিয়েছে। গান শোনাকে হারাম ঘোষণা করেছে। একেতো গান- তাও আবার ইসলামী। মৌচাকে ঢিল ছুঁড়ে কাজ নেই। আমার কোম্পানী থেকে রেকর্ড বের হলে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। জানেন তো 'প্রাচীন কাহিনী' লিখে দুইজন হিন্দু ভদ্রলোক খুন হয়েছেন। এবারে আমাকে মেরে ফেলতে চান ? বাদ দিন ঐ সব মতলব।

দমে গেলেন আব্বাসউদ্দীন। কিন্তু বাদ দিতে পারলেন না মতলবটা মাথা থেকে। রইলেন সুযোগের অপেক্ষায়।

খঞ্জনপুরের ঘটনাটা আব্বাস কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছেন না। এদিকে নজরুলকে তিনি কথা দিয়েছেন। বাধ্য হয়ে অন্য পথ ধরলেন তিনি। ভগবতী বাবু ছাড়া কাজ উদ্ধার হবে না। তাই তিনি আরো ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা শুরু করলেন তার সাথে। নজরুলের কয়েকটা গান রেকর্ড করালেন। কিন্তু পারিশ্রমিকের দাবী করলেন না।

এর মধ্যে কেটে গেলো আরো ছয় মাস। একদিন দুপুরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আব্বাস গিয়েছেন গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সেল রুমে। দেখলেন, ঘরের এক কোণে বসে বৃষ্টি দেখছেন আর গল্প করছেন ভগবতী বাবু। শ্রোতা গায়িকা আশ্চর্যময়ী দেবী। কি নিয়ে দু'জনে বেশ হাসাহাসিও করছেন। ভগবতী বাবু যে আবেগের মধ্যে আছেন বুঝতে কষ্ট হলো না তার।

এমন একটা সুযোগ যেন আল্লাহ মিলিয়ে দিলেন। কাছে যেয়ে দাঁড়াতেই ভগবতী বাবু বললেন,-বসুন আব্বাস সাহেব। মনে হচ্ছে কোনো আরজি নিয়ে এসেছেন।

—আরজি তো একটা পেশ করাই আছে। সেটা মঞ্জুর করলে ধন্য হই।

—কোন আর্জি ? খুলে বলুন।

—ইসলামী গান নিয়ে একটা পরীক্ষা করেই দেখুন না। আমাকে কিংবা নজরুলকে কোনো সম্মানী দিতে হবে না। গান না চললে অন্য গান গেয়ে পুষিয়ে দেবো আপনাদের।

—আমার ভয় আপনাদের মৌলভীদের নিয়ে। তারা আবার আগুন জ্বালিয়ে না দেয়।

— কিছু হবে না। মুসলমানরা আজকাল গোলার ধান বিক্রি করে গ্রমোফোন যন্ত্র কিনছে। আশ্চর্যময়ী দেবীও সমর্থন জানালেন আব্বাসের কথায়।

www.pathagar.com

ভগবতী বাবু সত্যিই মৌজে ছিলেন। আজ আর তিনি অমত করলেন না। বললেন,- আপনি দেখছি নাছোড়বান্দা। ঠিক আছে, নজরুলকে বলুন। তবে দুইটার বেশি নয়।

আসমান হাতে পেলেন আব্বাসউদ্দীন। শুনলেন, পাশের ঘরে নজরুল আছেন। ইন্দুবালাকে গান শেখাচ্ছেন।

উড়তে উড়তে আব্বাস ঢুকলেন সে ঘরে। নজরুলকে পেয়ে বললেন,- কাজীদা, নতুন খবর আছে আমার কাছে। গান শেখানো বাদ দিন।

—বিয়ের জন্য পাত্রী দেখে এলে নাকি ? হেসে উঠলেন নজরুল।

— ওসব নয়। ইসলামী গানের বিষয়ে ভগবতী বাবুকে রাজী করানো গেছে।

খবরটা শুনে নজরুলের মনও আনন্দে নেচে উঠলো। ইন্দুবালাকে ছুটি দিলেন তৎক্ষণাৎ। বাড়ি যেতে বললেন তাকে।

কি হলে নজরুলের মাথা খোলে আব্বাসের তা জানা আছে ভালোই। পিয়ন দশারথকে দিয়ে এক ঠোংগা পান আর গরম গরম চা আনালেন। তারপর বন্ধ করে দিলেন ঘরের দরজা।

—তুমি কি পাগল হলে ? দরজা বন্ধ করলে কেন ?

—কেউ যেন বিরক্ত করতে না পারে।

—কি ধরনের গান লিখবো, একটা ধারণা দাও।

— এক মাস পরে রমজান মাস শুরু হতে যাচ্ছে। তারপর মুসলমানদের সবচেয়ে বড় উৎসব ঈদুল ফিতর। রেকর্ড বাজারে আসতে কিছুটা সময়ের দরকার হয়। এমন গান লিখুন যেন ঈদের কথা থাকে। মুসলমানদের জন্য যেন ঈদের উপহার হিসেবে এই গান আমরা বাজারে দিতে পারি।

কবি বসলেন লিখতে। মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যেই তিনি লিখে ফেললেন একটি অসাধারণ সুন্দর গান। এর মধ্যে আবার দুইবার চা আর তিনবার পান খেয়েছেন। গানটার বাণী বড় চমৎকার লাগলো আব্বাসউদ্দীনের। তখনই কবি হারমোনিয়াম নিয়ে বসে পড়লেন সুর সংযোগ করতে। আব্বাস সুরও আয়ত্ত করে নিলেন। 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' গানখানি সৃষ্টি হলো এভাবে।

নজরুল ফুটছেন টগবগ করে। বললেন,-কাল আবার ঠিক এই সময়ে এখানে এসো। অপর পিঠটা লিখে দেবো।

www.pathagar.com

রাতে আর ঘুম এলো না আব্বাসের চোখে। একই দিনে ভগবতী বাবুকে রাজী করানো, নজরুলকে দিয়ে গান লেখানো, সুর করা তা আবার কণ্ঠে তুলে নেওয়া–সৃষ্টি সুখের উল্লাসে আব্বাস দিশেহারা।

পরদিন আবার আব্বাসউদ্দীন হাজির হলেন রিহার্সেল রুমে। নজরুল তার অপেক্ষাতেই ছিলেন। সময় ব্যয় হবে ভেবে আসার সময় সাথে করে পান এনেছেন আব্বাসউদ্দীন। কান্ড দেখে নজরুল হাসলেন। আবারো বন্ধ হলো ঘরের দরজা। নজরুল আজ লিখলেন 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর'। সুর সংযোগও হয়ে গেলো সাথে সাথে।

আব্বাস এবং নজরুল দুজনেরই তর সয় না। এতো দিনে কওমের খিদমতের জন্য একটা কাজের মতো কাজ তারা করতে পেরেছেন। ভগবতী বাবুকে তাগাদা দিয়ে উত্যক্ত করে ছাড়লেন। নজরুল আর আব্বাস-এদের কাউকে তো আর উপেক্ষা করা যায় না ? মাত্র চার দিনের মধ্যে গান রেকর্ডিং এর ব্যবস্থা করা হলো।

রেকর্ডিং এর দিন দেখা দিলো আরেক সমস্যা। গান দুটো পুরোপুরি মুখস্ত করার সুযোগ পাননি আব্বাসউদ্দীন। দ্বিতীয় গানটার স্থায়ী আর সঞ্চারীতে ওলট পালট হতে লাগলো। নজরুল গান দুটি সাদা কাগজে বড় করে লিখলেন। রেকর্ডি এর সময় তা মেলে ধরে রাখলেন আব্বাসের সামনে। এবার দেখে দেখে গেয়ে গেলেন আব্বাসউদ্দীন।

ইসলামী গান রেকর্ড করতে যেয়ে আব্বাসের মনে হলো উর্দ্দু গানের কথা। কাওয়ালরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কাওয়ালী শুনিয়ে বেশ লোক জমায়েত করছে। রাত জেগে উর্দ্দুভাষী মুসলমান ঘরের ছেলেরা কাওয়ালী শোনে। দুইটা কাওয়ালী রেকর্ড করাতে পারলে কেমন হয় ? ইসলামী গানের সাথে এই গানের বাজারও পরীক্ষা করা যেতো।

পিয়ারু কাওয়াল বেশ নাম করেছেন কাওয়ালী গেয়ে। আব্বাস গেলেন তার কাছে। বাঙালী মুসলমান ছেলে কাওয়ালী গাইবে, খুশিই হলো সে। বেশ ধৈর্যের সাথে দু'খানা উর্দ্দু কাওয়ালীর উচ্চারণ শিখিয়ে দিলো সে আব্বাসউদ্দীনকে। গান দু'টি শুনে ভগবতী বাবুও পছন্দ করলেন। রেকর্ডিং এর ব্যবস্থা হলো। একটা হলো 'য়্যায় বাদে স্যবা গুজরেখো' এবং অন্যটা 'মেরে আহমদ য্যগ উজিয়ালে'।

সবেবরাত পার হয়ে গেছে। পিয়ারু কাওয়াল একদিন প্রস্তাব দিলো তাদের একটা বড় কাওয়ালী গানের অনুষ্ঠানে গান গাইতে। আব্বাস সহজে রাজী হয়ে গেলেন। যে দুইটা কাওয়ালী রেকর্ড করা হয়েছে তা যদি আগেভাগে সাধারণ

www.pathagar.com

শ্রোতার সামনে গাওয়া যায় এবং জনপ্রিয় করা যায়, মন্দ কি। রেকর্ড-গুলো দ্রুত বিক্রি হয়ে যাবে। আরো রেকর্ড করাবার জন্য কোম্পানীও উৎসাহিত হবে।

রাতের বেলা শুরু হলো অনুষ্ঠান। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। রাত বাড়ে কিন্তু অনুষ্ঠান শুরু হয় না। তারপর গভীর রাতে শুরু হলো কাওয়ালী। পান খেতে খেতে দীর্ঘক্ষণ ধরে একই গান গাওয়া। ভারি বিপদে পড়লেন আব্বাস উদ্দীন। তবুও গাইলেন। তার শুদ্ধ উচ্চারণে গাওয়া কাওয়ালী এতো সুন্দর হলো যে, উর্দ্দুভাষী লোকেরা বুঝতেই পারলো না গায়ক একজন বাঙালী যুবক। তারা আনন্দে উদ্বেলিত হলো, পিয়ারু কাওয়াল ছাড়াও তাদের মন ভরানোর মতো আরো একজন কাওয়াল আছে ভেবে।

এবার আমন্ত্রণ আসতে লাগলো কাওয়ালী শোনাবার জন্য। কিন্তু এই পথে আব্বাস আর পা বাড়ালেন না। রাত জেগে গান গেয়ে বেড়ানো তার কর্ম নয়। বাদ দিলেন এই অধ্যায়।

এসে গেলো রমজান মাস। আব্বাস কুচবিহারে দেশের বাড়িতে ঈদ করবেন। বরাবরই তাই করেন। কিছু কেনাকাটার জন্য গেলেন ধর্মতলা এলাকায়। পথে দেখা হলো তার সেনোলা রেকর্ড কোম্পানীর বিভূতিভূষণের সাথে।

— আব্বাস, আমি মনে মনে তোমাকেই খুঁজছি। চলো একটা ফটো গ্রাফারের দোকানে।

—হঠাৎ ফটোগ্রাফারের দোকানে কেন ? মেয়ে ঠিক করেছেন নাকি ?

—তা প্রায় ঠিক করে ফেলেছি। সাথে পাঞ্জাবী আছে তো ?

— এই মাত্র কিনলাম ঈদের নামাজ পড়বো বলে। কিন্তু টোপর কেনা হয়নি এখনো।

— ঠাট্টা রাখো। তোমার একটা ছবি নিবো। তোমার গাওয়া নজরুলের লেখা ঈদের গান দু'টি বাজারজাতকরণের দায়িত্ব পেয়েছি আমরা। গায়কের ছবিসহ সেগুলো ছাড়া হবে বাজারে।

এতোক্ষণে ব্যাপারটি পরিষ্কার হলো আব্বাসের কাছে। পাঞ্জাবী পরে ছবির জন্য একটা পোজ দিলেন তিনি।

ঈদের ছুটিতে আব্বাস গেলেন বলরামপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে। ঈদের পরে আরো তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়েছেন অফিস থেকে। গ্রামে যেয়ে গান গেয়ে, ঘুরে বেড়িয়ে বেশ কাটাতে লাগলেন। কয়েকটি অনুষ্ঠানে ঈদের গান দু'টিও গাইলেন। পরীক্ষা করলেন, মুসলিম সমাজ এটা নিবে কিভাবে ? সাড়া পেলেন ভালোই। আসরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলো শ্রোতারা।

www.pathagar.com

ছুটি শেষে আব্বাস ফিরে এলেন শহরে। অফিসে যাচ্ছেন ট্রামে চড়ে। পাশে বসা ছেলেটি গুনগুন করে গাইছে, ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে--।

অবাক হলেন আব্বাসউদ্দীন। এই গান এই ছেলেটি শুনলো কি করে ? মুহূর্তে বুঝতে পারলেন, কোম্পানী হয়তো রেকর্ডটি বাজারে ছেড়েছে।

অফিসে আর মন বসাতে পারলেন না। সময় যেন কাটতে চায় না। অফিস শেষে গেলেন বিভূতিভূষণের দোকানে। ভদ্রলোক একেবারে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। বেয়ারাকে পাঠালেন সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতুয়া, চা আনতে। আনন্দে ছেলে মানুষের মতো শুরু করলেন ব্যবহার।

—কি হয়েছে ব্যাপারটা আগে আমাকে বলুন।

—কি হয়নি তাই বলো ? কোথায় ছিলে এতোদিন ? দুই হাজার রেকর্ড আমাদের বিক্রি করতে সময় লাগে দুই বছর। আর তোমার ঈদের গান এই তিন সপ্তাহে বিক্রি হয়েছে পাঁচ হাজার কপি। এই দেখো, আরো দুই হাজার মজুত রেখেছি। টেকনিশিয়ানরা তো রেকর্ড সাপ্লাই দিতে হিমসিম খাচ্ছে।

—আর আমার এই ছবি ? এইগুলোও বিক্রি করছেন নাকি ?

—পাগল। প্রচারের জন্য এই পোস্টার ছেপেছি। আশি হাজারের মতো ঈদের ময়দানে বিতরণ করা হয়েছে মুসল্লিদের হাতে হাতে। এই কয়খানা রেখেছি। তুমি কিছু নিয়ে যাও। বিলিয়ে দিও বন্ধু বান্ধবদের মাঝে।

আব্বাস বুঝলেন, ইসলামী গান তার উৎরে গেছে। এর আগে রেকর্ডের সাথে শিল্পীর ছবিওয়ালা লিফলেট ছেপে তা পরিচিত করানোর জন্য আব্বাস কতো করে কোম্পানীকে অনুরোধ করেছেন। বাড়তি খরচের ভয়ে তারা এদিকে যায়নি। এবারে রেকর্ডের বিক্রি দেখে হয়তো তাদের হুস হয়েছে।

আব্বাস তখনই দৌড়ালেন কাজী নজরুলের বাসায়। এই কৃতিত্বের দাবীদার তিনিই। এমন অমীয় বাণী, এমন মধুমাখা সুর তিনিই তো দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত তার কাছে।

বাসায় যেয়ে শুনলেন, নজরুল গিয়েছেন গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সেল রুমে। এলেন সেখানে। নজরুল তখন দাবা খেলছিলেন। আব্বাসকে দেখে উড়তে উড়তে এলেন। এমনভাবে বুকে জড়িয়ে ধরলেন যে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। মুক্তি পেলেন বহু কষ্টে।

নজরুল খুব যত্ন করে আব্বাসকে বসালেন তার পাশে। বললেন,– আব্বাস, তুমি আমার কাফের নাম ঘুচিয়ে দিয়েছো। গান দু'টি বাজারে যাবার পরে কতো যে চিঠি আসছে অভিনন্দন জানিয়ে–ইয়ত্তা নেই। মাত্র দুইটা গানে বাংলার

www.pathagar.com

মুসলমানরা আমাকে 'মৌলভী নজরুল' বলে ডাকা শুরু করেছে। সেদিন তো ঘটেছে এক মজার কান্ড।

—কেউ কি জামাই হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ?

—তেমনই ব্যাপার। এক মসজিদের ইমাম সাহেব এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। গায়ে মাথায় কতো হাত বুলালেন। তারপর মুখে দাড়ি নেই দেখে ভারি আফসোস করতে লাগলেন।

—বাবরি চুলের সাথে দাড়িটাও রেখে দিন। মানাবে ভালো।

—তোমার প্রস্তাবটা বিবেচনাধীন থাকলো। একজন এসে একটা তসবিহও উপহার দিয়ে গেছে। এবার বাঙালী মুসলমানদের কাছে তুমি আমাকে নবরূপে পরিচয় করিয়ে দিয়েছো। এর জন্য তোমার কাছে আমি ঋণী রইলাম সারা জীবন।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ভগবতী বাবু। কিন্তু নজরুলের আবেগ-উচ্ছাসের ঠেলায় এতোক্ষণ একটা কথাও বলার সুযোগ হয়নি তার। এবারে নজরুলকে থামতে দেখে বললেন,—কবি এবং গায়ক দুজনেই আপনারা উপস্থিত আছেন। আরো কয়েকটা গান দিন। মুসলমানদের এই জোস ধরে রাখতে হবে।

ইসলামী গানের কথা শুনে নাখোশ হয়ে এই ভগবতী বাবু কতোই না কথা শুনিয়েছেন আব্বাসউদ্দীনকে। তাকে রাজী করাতে লেগেছে ছয়টি মাস। কতোভাবেই না তার উমেদারী করেছেন। আর আজ সেধে সেধে গান রেকর্ডের কথা বলছেন। আব্বাস এটাই তো চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তার। এবার ভগবতী বাবুকেই ঘুরতে হবে তাদের পিছনে।

আব্বাস আর থামলেন না। নজরুলকেও দিলেন না থামতে। শুরু হলো একের পর এক ইসলামী গান লেখা, সুর করা এবং তা কণ্ঠে উঠানো। এদিকে ভগবতী বাবু হা করে বসে আছেন, কখন আব্বাসউদ্দীন বলবেন,—রেকর্ডের জন্য প্রস্তুত হন।

আল্লাহ-রসুলের গান পেয়ে বাংলার মানুষের ঘরে ঘরে জাগলো নতুন উন্মাদনা। ধান-পাট, তামাক-সরিষা বিক্রি করে কলের গান কিনতে লাগলো তারা। একদল লোক কলের গান গ্রামে গঞ্জে নিয়ে শোনাতে লাগলো সাধারণ মানুষকে। গান শুনিয়ে দু'পয়সা আয় করার মওকা পেলো তারা।

গান শুনলে যেসব মৌলভীরা কানে আঙুল দিতো এখন তারা তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলো আব্বাসের গাওয়া নজরুলের 'আল্লা নামের বীজ বুনেছি' 'নাম মোহাম্মদ বোল রে মন নাম আহম্মদ বোল' 'আল্লাহ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়' 'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়' 'তোরা দেখে যা আমেনা

www.pathagar.com

মায়ের কোলে' ইত্যাদি হৃদয় পাগল করা গানগুলো। এই সব গানের সুর এসেছে কখনো কোকিলের কলতান হতে, আবার কখনো বা সমুদ্রের ঢেউ হতে।

ইসলামী গানের চাহিদা বেড়ে গেছে ব্যাপকভাবে। দিনের বেলা চাকরি করতে হয় বলে আব্বাস বেশি সময় পান না নজরুলকে দিয়ে গান লেখাতে। রিহার্সেল রুমে এসে বসলেই অন্যান্যরা জাকিয়ে ধরেন নজরুলকে। শ্যাম বিষয়ক যে সব গান নজরুল ইতোমধ্যে লিখেছেন তা শুনে বাঙালী হিন্দুরা মেতে উঠেছে। নজরুলের আধুনিক গানের চাহিদাও কম নয়। তাই অন্যান্যরা তাকে শ্যাম বিষয়ক গান আর আধুনিক গান লিখিয়ে নেয় এক প্রকার জোর খাটিয়ে। আব্বাস যখন আসেন, নজরুলকে আর একা পান না।

বিপদে পড়লেন আব্বাসউদ্দীন। দুইশত বছর মুসলমানরা ঘুমিয়েছিল। গানের মাধ্যমে তাদের ঘুম ভাঙানো গেছে। সদ্য জেগে উঠা মুসলমানদের প্রাণে ইসলামী ভাবধারার জোয়ার বইয়ে দিতে হবে। এ বিষয়ে নজরুল ছাড়া বিকল্প নেই। কিন্তু তাকেই পাওয়া যাচ্ছে না নিরিবিলিতে।

আব্বাস ধরলেন তাই অন্য পথ। বাসা থেকে বের হওয়ার আগে নজরুলকে ধরতে হবে। খুব ভোরে উঠে হাঁটতে হাঁটতে আব্বাস চলে এলেন নজরুলের বাসায়। কিন্তু কাজের ছেলে দরজা খুলে তাকে জানিয়ে দিলো, কবি বাসায় নেই।

এই ভাবে কয়েকদিন চললো। কাজের ছেলের সেই একই জবাব, কবি বাসায় নেই।

এক ছুটির দিনে আব্বাস তাই ভোর হবার আগেই উঠলেন। ফজরের নামাজ পড়লেন নজরুলের বাসার কাছাকাছি এক মসজিদে। মাথার টুপি না খুলেই হাজির হলেন নজরুলের বাসায়। আজ কবির সাথে দেখা না করে যাবেন না তিনি।

দরজায় কড়া নাড়তেই যথারীতি বেরিয়ে এলো কাজের ছেলেটি। আজো শোনালো ওই একই কথা, কবি বাসায় নেই। এতো ভোরে কবি কোথায় গেছেন সে জবাব না দিয়েই বন্ধ করে দিলো দরজা। আব্বাস আজ পণ করেই এসেছেন। রণে ভঙ্গ না দিয়ে বসে রইলেন সিঁড়িতে। যতো দেরি হোক না কেন দেখা তিনি করবেনই।

প্রায় ঘন্টা দুই এইভাবে তিনি বসে আছেন। হঠাৎ খুলে গেলো ঘরের দরজা। বের হয়ে আসলেন স্বয়ং নজরুল। আব্বাসকে সিঁড়িতে বসে থাকতে দেখে অবাক হলেন তিনি।

—তুমি কতক্ষণ, আব্বাস ?

www.pathagar.com

—ঘন্টা দুই হবে। তা আপনি ভেতরে ঢুকলেন কোন পথ দিয়ে ?

—মানে ?

— কাজের ছেলের মুখে শুনলাম, আপনি বাসায় নেই। দরজা দিয়ে ঢুকবেন, এই আশাতে পাহারা দিচ্ছি সিঁড়িতে।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন নজরুল। বললেন,–বেটা আস্ত একটা গর্দভ। পাওনাদাররা বাসায় এসে বিরক্ত করে বলে ওকে বলে রেখেছি, আমার খোঁজ করলে যেন বলে, কবি বাসায় নেই। বেটা ওই কথা তোমাকে শুনিয়েছে আজ ?

—শুধু আজ নয়, গত ছয়দিন ধরে।

—ওর চাকরিটা এখনই খতম করে দেবার দরকার। কিন্তু তাও পারছি না। তিন মাসের মাইনে বাকি ওর।

—চাকরি খতম করে কাজ নেই। আমি যে পাওনাদার নই তা বেটা বুঝবে কেমন করে ? তা ইসলামী গান দিচ্ছেন না কেন ?

—লিখি কখন ? রিহার্সেল রুমে গেলে ওরা জোঁকের মতো লেগে থাকে। তুমি দুই দিন পরে ভোরে বাসায় এসো। দুইটা গান তৈরি করে দিতে পারবো।

দুই দিনে হলো না। পর পর বেশ কয়েকদিন আব্বাসকে যেতে হলো কবির বাসাতে। শুধু গান লিখলে তো হয় না ? তার সুর লাগে। কণ্ঠে উঠিয়ে নেওয়ার দরকার হয়।

ঘন ঘন কয়েকদিন কবির বাসায় যাওয়াতে আব্বাসের একটা বিষয় নজরে এলো। তা হলো কবির শাশুড়ীর ব্যবহার। ইসলামী গানের পিছনে কবি যে সময় ব্যয় করছেন তা আদপেই পছন্দ হচ্ছিল না তার। আব্বাস যে বিষয়টা বুঝতে পারলেন না, তা নয়। তবুও এড়িয়ে গেলেন জাতির বৃহৎ স্বার্থে।

একদিন খুব ভোরে ইসলামী গানের রেকর্ডের একটা নেগেটিভ কপি বাজাচ্ছিলেন নজরুল আর আব্বাসউদ্দীন, রেকর্ডটি কেমন হলো তা শোনার জন্য। আব্বাসউদ্দীন শুনতে পেলেন, নজরুলের শাশুড়ী ভেতরের ঘর থেকে বলছেন,–সকাল বেলা নুরু আর গান পেলো না শোনার–কি সব গান শুরু করে দিলো। মন্তব্যটা নজরুলের কানেও এলো। চুপসে গেলেন তিনি একেবারে।

www.pathagar.com

চার

আব্বাস খবর পেলেন, রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কৃষি দপ্তরে একটা স্থায়ী পদ খালি হয়েছে। ডি, পি, আই অফিসে দুই বছর ধরে চাকরি করছেন। পদটা অস্থায়ী বলে সমস্যাও বেশি। স্থায়ী পদে যেতে পারলে বাড়তি কিছু সুবিধা পাওয়া যেতো। পদটার জন্য দরখাস্ত করলেন আব্বাসউদ্দীন।

কোনো রকম তদবির ছাড়াই চাকরিটা পেয়ে গেলেন আব্বাসউদ্দীন। মুসলমান ঘরের ছেলে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক আর আই, এ পাশ দেখে বড় কর্তারা সন্তুষ্ট হয়ে নিয়োগপত্র পাঠিয়েছেন তার নামে। নতুন চাকরিতে যোগদান করলেন তিনি।

জীবনের ছন্দ পতন হলো বেশ খানিকটা। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে চাকরি বলে অফিসে উপস্থিত থাকতে হয় সর্বক্ষণ। কণ্ঠে নতুন গান তোলার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। নজরুলের পিছনেও সময় দিতে পারছেন না। রেকর্ডিং এর তো প্রশ্নই ওঠে না।

এইভাবে চললো কয়েকদিন। আব্বাস কাউকে বলতেও পারছেন না গান বাজনার কথা। নতুন চাকরিতে অফিসে ছুটি চাইলে মানানসই হবে না। বেশ একটা বিড়ম্বনার মধ্যেই পড়ে গেলেন তিনি।

এই সময়ে একদিন অফিসের বড়কর্তা ডেকে পাঠালেন তাকে। ভয়ে ভয়ে আব্বাস গেলেন দেখা করতে। তাকে দেখে বড় কর্তা বললেন,–নোট উথাপক হিসেবে আপনার নাম আব্বাসউদ্দীন দেখলাম। আপনার নামে একজন গায়ক আছেন। তার রেকর্ড বাজারে খুবই চলছে। পরিচয় আছে তার সাথে ?

—আমিই সেই আব্বাসউদ্দীন।

—বলেন কি সাহেব ? চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন বড় কর্তা। অনুযোগের সুরে বললেন,–পরিচয় গোপন করেছেন কেন এতোদিন ?

—গান বাজনা নিয়ে আছি শুনলে হয়তো চাকরিটা হতো না।

— ভুল করেছেন। আমি গায়ক আব্বাসউদ্দীনের ভক্ত। তা গান রেকর্ড করেন কখন ?

—আপাতত করতে পারছি না। ছুটির দিনে রেকর্ডিং কোম্পানীর অফিসও বন্ধ থাকে। অন্য দিন অফিস সময়ে বাইরে যেতে পারছি না। বেশ অসুবিধায় পড়ে গেছি।

বড় কর্তা যদুনাথ সরকার তখনই হেড কেরানীকে ডেকে বলে দিলেন,–দেখুন, আব্বাসকে কোনো জটিল কাজ দিবেন না। অফিসে সে

www.pathagar.com

একবেলা কাজ করবে। তারপর ওর ছুটি। এমন একজন গুণী লোককে আমাদের দপ্তরে পেয়েছি, এতেই আমরা গর্বিত।

কোলকাতার এই বিরূপ পরিবেশের মধ্যে এতোখানি বদান্যতা আব্বাস আশা করেননি। সৃষ্টিকর্তাই যেন তাকে সুযোগ করে দিলেন। একটা বড় বাধা দূর হলো তার।

একদিন এক যুবক এসে দেখা করলো আব্বাসের সাথে। পূর্ব বাংলার ফরিদপুরে তার বাড়ি। কবিতা লেখেন। এম, এ পড়ছেন কোলকাতায়। আব্বাসের সমবয়সী হবেন। নামেরও মিল আছে–জসিমউদ্দীন।

কবি তার কবিতার খাতাটি দেখালেন। তখন সবে পল্লী বাংলাকে নিয়ে তিনি কবিতা রচনা শুরু করেছেন। কয়েকটি গানও রচনা করেছেন। আব্বাস আগ্রহের সাথে তার খাতাটি দেখলেন। সবই আঞ্চলিক গান। পূর্ব বাংলার ভাষায় লেখা। সহজ সরল বর্ণনা।

—আমার দু'একটি গান রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করা যায় ? আগ্রহের সাথে বললেন জসিমউদ্দীন।

— ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষার গান বলে একটু সময় লাগবে। আপনার ঠিকানা রেখে যান। সময়মতো আপনাকে খবর দিবো আমি।

আব্বাসউদ্দীন আশ্বাস দিয়েছেন, এতেই খুশি জসিমউদ্দীন। অবহেলিত পূর্ব বাংলার লোক। তারপর গরীব পরিবারের সন্তান। গান লিখে মানুষের মনে ঠাঁই করে নেয়াই তার উদ্দেশ্য। খুশি মনে বিদায় নিলেন তিনি গায়কের নিকট হতে।

আব্বাসের এতোদিনের চাকরিটা ছিল অস্থায়ী। গান গেয়ে পয়সা আসে। কিন্তু এই অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করে সংসার পাতা যায় না। এখন পাকা চাকরি হয়েছে। বয়সও কম হলো না। আব্বাসের বন্ধুরা ইতোমধ্যে সংসারী হয়েছেন। এবার সংসারী হওয়া যায়। চিঠিতে কথাটা জানিয়ে দিলেন আব্বাস পিতাকে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে যখন বলরামপুরে ছিলেন, আব্বাস বিয়ের কথা পেড়েছিলেন মায়ের কাছে। কিন্তু বাবা কিছুটা অমত করেছিলেন বলে সে বিয়ে হয়নি শেষ পর্যন্ত। বাবার মতামতকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেছিলেন আব্বাস উদ্দীন। এখন ছেলে উপযুক্ত হয়েছে। কোলকাতায় চাকরি করছে। গান গেয়েও পেয়েছে প্রতিষ্ঠা। বাবা তাই আব্বাসের বিয়ের ব্যাপারে যোগাযোগ করলেন আব্বাসেরই বাল্যবন্ধু মোশারফ হোসেনের সাথে। মোশারফ হোসেন থাকেন তার দেশের বাড়ি রংপুরের ডোমারে। পিতার বিশাল ভূ-সম্পত্তি দেখাশুনা করে দিন কাটে তার।

www.pathagar.com

মোশারফ হোসেন আর অপেক্ষা করলেন না। মেয়ে তার একটা দেখা আছে। আব্বাসকে চিঠি লিখলেন তিনি ডোমারে আসতে।

মেয়ে দেখে আব্বাসেরও পছন্দ হলো। বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করে আব্বাস ফিরে গেলেন কোলকাতায়।

শুভদিনে আব্বাস কোলকাতা থেকে কয়েকজন বন্ধুসহ এলেন রংপুরে। ভালোয় ভালোয় সম্পন্ন হয়ে গেলো বিয়ের অনুষ্ঠান। বাকি রাতটুকু কোলকাতার বন্ধুরা আর ঘুমাতে চাইলেন না। তারা চাইলেন, বিয়ের অনুষ্ঠানেই একটা গানের আয়োজন করতে। প্রস্তাবটা শুনে গ্রামের যুবকরা মহা খুশি। দেশের সেরা শিল্পী তাদের গ্রামের দুলা। আব্বাসের সাথে এসেছেন আরো শিল্পী ও যন্ত্রীর দল। বিখ্যাত সেতার বাজিয়ে তকরীম আহমেদও বরযাত্রী দলে আছেন। সেতারটি তার সঙ্গেই ছিল। তাতে তিনি টুং টাং শব্দ তুললেন। অমনি দেখা দিলো বিপত্তি। তেড়ে এলো বাড়ির মুরব্বিরা।

—গান ? নাউযুবিল্লাহ। বিয়ে ফরজ কাজ। সেই অনুষ্ঠানে গান ? তা হতে পারে না।

—গান বাজনার মাধ্যমে আমরা একটু আনন্দ করতে চাই। বিয়ে তো আনন্দেরই বিষয়। আমতা আমতা করে বললো আব্বাসের বন্ধুরা।

—না, তা হতে দেয়া যাবে না। গান না-জায়েজ কাজ। বিয়ে বাড়ি বাদে আপনারা অন্য কোনোখানে যতো খুশি গান গাইতে পারেন। তাতে আমাদের আপত্তি নেই।

নতুন শ্বশুর বাড়ির লোকজনের আচরণে আব্বাস মনে বড় ব্যথা পেলেন। বেশ অভিমান হলো তার। বিয়ের আসর থেকে উঠলেন। বন্ধুদের নিয়ে বের হলেন পথে। উঠলেন গ্রামের স্কুলঘরে। নির্জন মাঠের মাঝখানে স্কুলটি।

কিছুক্ষণ পরেই শুরু হলো ঝড় আর বৃষ্টি। প্রকৃতি ধারণ করলো রুদ্র রূপ। যেন উপড়ে ফেলবে সবকিছু। বন্ধুরা এই বৃষ্টি উপভোগ করার জন্য গান ধরলেন সম্মিলিতভাবে।

গান শেষে স্কুলের দুইটা করে বেঞ্চ একসাথে করা হলো। আয়োজন করা হলো নিদ্রার। এক সময়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়লেন তারা।

ঝড় আর বৃষ্টির মধ্যে শ্বশুর বাড়ির লোকজন আর সাহস করে জামাই খুঁজতে বের হলেন না। তারা ভাবলেন, পাখিকে যখন শিকল পরানো গেছে, যাবে কোথায় ? খাঁচায় তাকে আসতেই হবে ফিরে।

www.pathagar.com

সকাল বেলা শুরু হলো জামাই অন্বেষণ। আব্বাস আর তার দলবলকে পাওয়া গেলো স্কুলের বেঞ্চের উপর। খালি মাথায়, বিছানা ছাড়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন তারা।

ঘুম ভাঙানো হলো তাদের। বন্ধুদের মুখ হাড়ির তলা। কি আর করা। অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তাদের নিয়ে আসা হলো কনের বাড়িতে। তারা এলেন একটা শর্তে। গান গাইতে দিতে হবে। মেয়ে পক্ষের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। তাই আর আপত্তি করলেন না তারা।

দু'দিন বেশ আনন্দের মধ্যে গান বাজনা করে আব্বাস ও তার দলবল ফিরে এলেন কোলকাতায়। আবার চলতে লাগলো রুটিন মাফিক কাজকর্ম।

আব্বাস অনুভব করলেন, এখন আর সেই বন্ধনহীন জীবন নয়। বাড়তি একটা দায়িত্ব এসে গেছে তার উপর। কোলকাতায় একটা বাসা নিতে হবে। বধূকে আনতে হবে শহরে। তাই একটা পছন্দসই বাসা খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন তিনি।

শেষমেষ পছন্দসই একটা বাসা পেয়েও গেলেন তিনি। ভাড়া ঠিক হয়ে গেলো। এক সপ্তাহ পরে গিন্নীকে নিয়ে বাসায় উঠবেন তাও ঠিক হয়ে গেলো। এবার গৃহস্বামী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,-সব তো ঠিক হলো। আপনার নামটা জানা হলো না।

—আব্বাসউদ্দীন।

—আপনি মুসলমান ? আপনার সুন্দর চেহারা দেখে এতোক্ষণ আপনাকে আমরা ভদ্রলোকই ভেবেছিলাম। না মশায়, আপনাকে ভাড়া দেওয়া যাবে না। অযথা সময় ব্যয় করালেন আমার। গৃহস্বামী কোনো কথা বলার সুযোগ দিলেন না আব্বাসকে। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন মুখের উপর।

'ভদ্রলোকের' এইরূপ ব্যাখ্যায় আব্বাস একেবারে মুষড়ে পড়লেন। নজরুলকে দিয়ে ইসলামী গান লেখানোর জন্য, তা রেকর্ডিংয়ের জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু তাতে একটুও কষ্ট অনুভব করেননি কখনো। জাতির সেবা করতে পারছেন, এই ভেবে আত্মতৃপ্তি পেয়েছেন সব সময়ে। কিন্তু আজ সামান্য একজন বাড়িওয়ালা, তাও নিম্ন বর্ণের হিন্দুর কাছ থেকে এমন রূঢ় আচরণ তিনি সহ্য করতে পারলেন না। মেসে এসে সারারাত কেঁদে কাটালেন তিনি।

বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের ওই কথাটা আব্বাসের মনে দারুণ রেখাপাত করলো। ঠিক করলেন, এখন থেকে প্রতিদিনই তার কাজ হবে কোলকাতায় যে

www.pathagar.com

সব মুসলমান ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য লড়ছেন তাদের কাতারে শামিল হতে হবে। দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

রাজনীতিবিদ হিসেবে পূর্ব বাংলার ছেলে এ,কে, ফজলুল হক বেশ নাম করেছেন। তখন তিনি থাকেন বেনে পুকুর লেনে। উকালতি করেন। আব্বাস গেলেন তার সাথে দেখা করতে।

আব্বাসকে পেয়ে খুশি হলেন ফজলুল হক। বললেন,-আমার কথা মনে পড়লো এতোদিনে ? মোহামেডান ক্লাব কোলকাতার মাঠে ফুটবল খেলে পর পর দু'বছর লীগ বিজয়ী হলো। খালি পায়ে তারা বুট পরা গোরা খেলোয়াড়দের সাথে খেলছে। বিজয় নিচ্ছে ছিনিয়ে। সে এক অসাধারণ ব্যাপার।

—আমিও যাই খেলা দেখতে। গর্বে আমারও মনটা ভরে ওঠে।

—তা হলে ? খেলার দিন মুসলমানরা রোজা রাখছে। দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর থেকে মুসলমানরা আসে খেলা দেখতে, খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে। মাত্র এগারোজন খেলোয়াড় সারা বাংলাদেশকে নাড়িয়ে দিলো। আর তোমার মতো একজন গায়ক চাকরি নিয়েই কি দিন কাটাবে ?

—আমি তো মুসলমান সমাজের জন্য গান গেয়ে চলেছি। নজরুলকে দিয়ে ইসলামী গান লিখিয়ে নিচ্ছি।

—তা করছো। তবে কয়জন মুসলমানের ঘরে কলের গান আছে ? এখন থেকে তুমি আমার সাথে থাকবে। গ্রামে-গঞ্জে যাবে। আমার বক্তৃতার আগে শ্রোতাদের গান শোনাবে। ফুটবল খেলোয়াড়দের দেখতে আসে শত শত লোক। তোমাকে দেখতে আসবে হাজার হাজার। তার আগে আজ আমাকে একটা গান শোনাও।

—কোন গানটা শোনাবো ?

—তোরা দেখে যা আমেনা মায়ের কোলে- গানটি।

খালি গলায়, চোখ বুজে আব্বাস গানটি ধরলেন। আবেগের সাথে হৃদয় উজাড় করে গাইলেন সবটুকু। চোখ মেলে দেখলেন, হক সাহেবের দু'চোখ বেয়ে ঝরছে অশ্রুর ধারা।

একজন খাঁটি মুসলমানের সংস্পর্শে এলেন আব্বাসউদ্দীন।

গ্রামোফোন কোম্পানীর পাইকারী পরিবেশক মিঃ জে, এন, দাস একটা নতুন কোম্পানী খুললেন। নাম দিলেন মেগাফোন কোম্পানী। হ্যারিসন রোডের উপর দোকান নেওয়া হলো। পাশেই রিহার্সেল রুম।

www.pathagar.com

নতুন কোম্পানী। তাই প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য তারা ধরলো আব্বাস আর নজরুলকে। আব্বাস মাঝে মাঝে সেখানে যান। আড্ডা দেন। রিহার্সেল রুমে আব্বাস একদিন হারমোনিয়াম নিয়ে তার কুচবিহার অঞ্চলের গান–

নদীর নাম সই কচুয়া
মাছ মারে মাছুয়া
মুই নারী দিচোং ছেকাপাড়া।– এই গানটি আওড়াচ্ছিলেন। এর মধ্যে নজরুল যে ঘরে ঢুকেছেন আব্বাস তা খেয়াল করেননি। গানটা শেষ হতেই নজরুল বললেন,–থামলে কেন ? সুন্দরই তো হচ্ছিল। আমি থামতে না বলা পর্যন্ত গাইবে।

আব্বাস আবার গানটা ধরলেন। বুঝলেন, কবির মাথায় কিছু একটা ঢুকেছে।

পনেরো মিনিট হয়েছে। এবার নজরুল বললেন,–এই গানটা নাও। ঠিক তোমার ওই গানের সুরে গাইবে–

নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা
পাখি সে নয় নাচে কালো আঁখি
আমি যাবো না অঞ্জনাতে
জল নিতে সখি লো
ঐ আঁখি কিছু রাখিবে না বাকী।

নজরুলের এই গানটি ভাওয়াইয়া সুরে গাইলেন আব্বাসউদ্দীন। তার নিজের কাছেই অতি চমৎকার মনে হলো।

কোম্পানীর মালিক জে, এন, দাস পাশেই ছিলেন। গানটি তার কানেও অসম্ভব সুন্দর লাগলো। রেকর্ড করাবার জন্য তখনই ধরলেন আব্বাস আর নজরুলকে। অপর পিঠের জন্যও তো একটা ভাওয়াইয়া দরকার। আব্বাস এবারে গাইলেন কুচবিহার অঞ্চলের 'তোরষা নদীর পারে পারে লো দিদিলো' গানটি। তার অনুকরণে নজরুল লিখলেন 'পদ্মা দীঘির ধারে ধারে'। অল্প দিনের মধ্যে রেকর্ডখানা বাজারে বের হলো এবং অসম্ভব রকম জনপ্রিয়তা পেলো। নজরুলের রচনা ও গ্রাম্য সুরের সংযোগে রেকর্ডকৃত এই গানের মাধ্যমেই ভাওয়াইয়া গানের ভূবনে দীপ্ত পদচারনা করলেন আব্বাসউদ্দীন। দু'খানা গানেই উঠে এলেন আলোতে।

গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সেল রুমে বসে আব্বাস একদিন গলা সাধছেন। কৃষ্ণচন্দ্র দের কীর্তন বাজারে বেশ চলছিল এই সময়ে। কৃষ্ণচন্দ্র দে

www.pathagar.com

চোখে দেখতেন না। কিন্তু কীর্তন গাইতেন বড় সুন্দর করে। আব্বাস কৃষ্ণচন্দ্রের 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বধূ ওইখানে থাকো গো' গানটাই গাচ্ছিলেন। আর গাচ্ছিলেন ঠিক কৃষ্ণবাবুর গলার স্বর নকল করে।

কাজী নজরুল ইসলাম কখন যে ঘরের মধ্যে ঢুকেছেন আব্বাস খেয়াল করেন নি। গান শেষ হলো। ঘরের মধ্যে ধীরেন দাসও উপস্থিত আছেন। তিনি নজরুলকে দেখিয়ে বললেন,–কাজীদা, দেখুন আব্বাস কি সুন্দর কৃষ্ণবাবুর নকল করছে।

আব্বাস জানেন, কীর্তন নজরুলেরও পছন্দের বিষয়। অন্যের গলা অবিকল নকল করে তিনি কীর্তন গাচ্ছেন তাতে নজরুলের প্রশংসা করারই কথা।

—দেখ আব্বাস, তোমাকে আমি যথেষ্ট স্নেহ করি। কৃষ্ণবাবু যতো সুন্দর গানই করুন লোকে তাকে 'কানা কেষ্ট' বলে। তার গলা নকল করার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই।

—কাজীদা, নকল করছিলাম না। তার কীর্তন তার সুরেই গাওয়ার চেষ্টা করছিলাম।

—ওই একই কথা। তুমি অন্ধ হওনি, চোখে চশমাও নাওনি। তুমি কেন কানাকেষ্ট হতে যাবে ? গলা নকল করে গান গাইলে সারা জীবন অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে বেড়াতে হবে। লোকে শুনলেই বলবে, আব্বাস–ও তো কেষ্ট বাবুর নকল। তুমি আব্বাস 'আব্বাস' হয়েই গড়ে উঠার চেষ্টা করো। নিজের স্বতন্ত্র বিসর্জন দেবে না। এমনকি সুরওনা।

বেশ বড় ধরনের একটা ধাক্কা খেলেন আব্বাসউদ্দীন। এতো লোকের মধ্যে নজরুল এভাবে তাকে তিরস্কার করবেন, ভাবতেও পারেননি। বুঝলেন, নজরুলের দাবী আছে তার উপর বলেই এমন কড়া কথা বলতে পারলেন। আর তো কাউকে বলেন না। শুধরেও দেন না।

সম্বিত ফিরে পেলেন আব্বাসউদ্দীন। নজরুল তাকে পথ দেখিয়েছেন। তার এলাকায় ভাওয়াইয়া গান আছে প্রচুর। মোষের পিঠে চড়ে রাখাল বালক এই গান গায়। লাঙ্গল চষার সময় কৃষকেরাও এই সুর তোলে। এমনকি তোরষা নদীর ধারে যে বধূ পানি আনতে যায় তার কণ্ঠেও সুর বাজে ভাওয়াইয়া গানের। এই গানগুলো কি প্রচার করা যায় না ? কৃষ্ণবাবুর কীর্তনের চেয়ে এই গানে অনেক কারুকাজ আছে। গানের কথাও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। ভাওয়াইয়া গানের সুরে নজরুলের লেখা যে দুইটা গান রেকর্ড হয়েছে, তার কাটতি তো কম হয়নি। তার অঞ্চলের ভাষাকে অবিকৃত রেখে এখনো তিনি গান দিতে পারেননি। তার সেই দুঃখ বোধটাকেই নজরুল যেন উসকিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

আবার ধরনা দিলেন আব্বাস গ্রামোফোন কোম্পানীর ম্যানেজারের কাছে। কুচবিহার অঞ্চলের ভাওয়াইয়া গান রেকর্ড করাতে চান।

—কুচবিহারের ভাষার গান ? কুচবিহারের কয়জন লোক গান শোনে ? রেকর্ড বিক্রি করতে কোম্পানী কি কুচবিহারে যাবে ? ওসব আঞ্চলিক ভাষার গান চলবে না।

—নজরুলের লেখা ভাওয়াইয়া গান দুটো তো বেশ চলেছে। কুচবিহারের ভাষাও বাংলা। এই ভাষায় রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি এবং আসামের বহু জায়গার লোক কথা বলে। রেকর্ড তারাই কিনবে। আর সুরের কারুকাজে মোহিত হয়ে কোলকাতার লোকেরাও কিনবে। যুক্তি দিলেন আব্বাস উদ্দীন।

—এক সপ্তাহ পরে আসুন। আগে আপনার দুইটা গান শুনবো। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

নজরুলের কথাটা মাথায় রেখেছেন আব্বাস। কণ্ঠ আর সুর দুটোকেই অবিকৃত রাখতে হবে। এই এক সপ্তাহ ধরে কুচবিহার অঞ্চলের দুইটা গান সেধে চললেন তিনি।

নির্দিষ্ট দিনে রিহার্সেল রুমে হারমোনিয়াম নিয়ে বসলেন আব্বাস। তার গানের সাথে দোতারা বাজাবার জন্য তৈরি হলেন কানাই লাল শীল। আব্বাস প্রথমে গাইলেন 'ওকি গাড়িয়াল ভাই, কত রব আমি পন্থের দিকে চায়ারে'। তারপর গাইলেন 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে'।

গান দুইটির ভাষা ভালো বুঝতে না পারলেও সুরের ঝংকারে আকৃষ্ট হলেন ম্যানেজার বাবু। রেকর্ড করানোর ব্যবস্থাও হলো।

তিন চার মাস পার হয়েছে এর মধ্যে। একদিন কোম্পানীর ম্যানেজার বাবু আব্বাসকে ডাকলেন তার রুমে। বললেন,–আপনার আঞ্চলিক ভাষার ভাওয়াইয়া গান উৎরে গেছে। সমুদয় কপি বিক্রি হয়েছে ইতোমধ্যে। এই ধরনের আরো কিছু গান সংগ্রহ করুন।

—গানের ভাষা তা হলে মন্দ নয়। আপনাদের রেকর্ড বিক্রি করার জন্য কুচবিহারে যেতে হয়নি ? আমি আগেই বলেছিলাম, আমাদের এলাকায় পৃথক কাব্য আছে, সাহিত্য আছে তার সার্বজনীন আবেদনও আছে।

—নাটক আছে কি ?

—তাও আছে।

www.pathagar.com

—তা হলে নাটকও যোগাড় করুন। রেকর্ড করাতে পারলে বেশ একটা বৈচিত্র আনা যাবে। গানের মাঝে মাঝে নাটক শুনে কানের বিশ্রাম দিতে পারবে শ্রোতারা।

এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। আব্বাসের আর তর সয় না। তার ছোট ভাই আবদুল করিমের লেখায় হাত আছে। বহু ভাওয়াইয়া গান তিনি রচনা করেছেন। এবার তাকে দিয়ে কুচবিহার এলাকায় মুখে মুখে প্রচলিত লৌকিক গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করলেন। তা রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করা হলো। 'মধুবালা' 'মরুচমতি কন্যা' 'রূপধন কন্যা' 'হলদি শানাই' 'মহুয়া' ইত্যাদি নাটক রেকর্ড হলো একে একে। ভাওয়াইয়া গান তো আছেই।

আঞ্চলিক ভাষার এই সব গান আর নাটক রেকর্ডিংয়ের জন্য দরকার হলো কুচবিহার অঞ্চলের শিল্পীর। খবর দিয়ে আনানো হলো নায়েব আলী, কেশব বর্মণ, ধীরেন চন্দ্র, সুরেন্দ্র নাথ রায় ইত্যাদি শিল্পীকে। এইসব শিল্পী এতোদিন গ্রাম বাংলায় গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। এবার আব্বাসের কল্যাণে গানের প্রাণকেন্দ্র কোলকাতায় আসার সুযোগ পেলেন। তাদের গানও রেকর্ডিং হতে লাগলো। মোটা অংকের অর্থও উপার্জন করতে লাগলেন তারা কোলকাতা মহনগরীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে।

একদিন কমল দাস গুপ্ত আব্বাসকে ডেকে বললেন,—দুইটি প্রথম বিভাগ পাওয়া ছেলের মাথায় এতো কম বুদ্ধি, আগে জানা ছিল না।

—বুদ্ধিহীনতার কোন কাজটা করলাম, দাদা ?

—ইসলামী গানের সাথে সাথে ভাটিয়ালী ভাওয়াইয়া গানেও তুমি প্রসিদ্ধ হচ্ছো। গানের সুরকার হিসেবে বহু শিল্পীকে গড়ে নিতে হয় আমাকে। আমি তাই জানি কে কতো বড় শিল্পী। যে কোনো গানেই তোমার গলার কারুকাজ বড় অদ্ভুত। একই গলা তুমি খাদে নামাতে পারো আবারো তা উঠাতে পারো পাহাড়ের উচ্চ শিখরে।

—অতিরিক্ত প্রশংসা হয়ে যাচ্ছে না ? বাধা দিলেন আব্বাসউদ্দীন।

—যার যা প্রাপ্য তা না দিলে তাকে অমর্যাদা করা হয়। যা বলছিলাম, একমাত্র তুমিই পারো ভাওয়াইয়া গানের সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত হতে। এই পথে তুমি প্রতিদ্বন্দ্বীর সৃষ্টি করছো কেন ?

বুঝতে কষ্ট হলো না কমলদাশ গুপ্তের ইঙ্গিতটা। বললেন,—আপনার কথাতেই ফিরে যাই। বিশাল এই বাংলাদেশে কতো গায়ক-গায়িকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কতো সম্ভাবনা বিকাশের অপেক্ষায় গুমরে মরছে। এদের হাত

www.pathagar.com

ধরে টেনে তোলার দায়িত্বটা আমাদের। আব্বাসউদ্দীন যেমন কমলদাশ গুপ্ত হতে পারবেন না তেমনি এরাও পারবে না আব্বাসউদ্দীন হতে।

আব্বাসউদ্দীনের মহৎ ও শিল্পীসুলভ এই হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হলেন কমলদাশ গুপ্ত। তার মাথায় বুলিয়ে দিলেন স্নেহাশীষের হাত।

কারমাইকেল হোস্টেলে আব্বাস গানের দাওয়াতে গেছেন। সেখানে পরিচিত হলেন কবি গোলাম মোস্তফার সাথে। ইনি স্কুলে শিক্ষকতা করেন, কবিতা লেখেন। গান লিখেছেন, তাতে সুরও করেছেন। আবার গানের গলাও আছে বেশ। কবির মধ্যে এতোগুলো গুণের পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হলেন আব্বাসউদ্দীন। এমন একজন লোকই খুঁজছিলেন তিনি মনে মনে। নজরুল ইদানীং আধুনিক গান নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। আগের মতো তার নিকট হতে আর গান পাওয়া যাচ্ছে না। গোলাম মোস্তফা তার গানের খাতা দেখালেন। দুইটি ইসলামী গান আব্বাসের খুবই পছন্দ হলো। রেকর্ড করাতে পারলে কাটতি হবে।

গান দু'টি রেকর্ডিং কোম্পানীরও পছন্দ হলো। রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেলো সাথে সাথে। 'নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি আমার মোহাম্মদ রসুল' এবং 'বাদশা তুমি দীন ও দুনিয়ার' গোলাম মোস্তফার রচিত গানদু'টি জনপ্রিয় করে তুললেন আব্বাসউদ্দীন।

এই সব কাজ করতে যেয়ে কবি গোলাম মোস্তফার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন আব্বাসউদ্দীন। একই মেসে ডেরা বাঁধলেন তারা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন একই সাথে। প্রায়ই দর্শকদের অনুরোধে নজরুলের ভাওয়াইয়া গান দু'টি গাইতে হয়। আব্বাসের মনে পড়লো পল্লী কবি জসিমউদ্দীনের কথা। তার লেখা পল্লী গানেরও জনপ্রিয়তা পাওয়া যেতে পারে। জসিমকে খবর দিলেন তিনি কোলকাতায় আসতে।

এর মধ্যে আব্বাস খবর পেলেন তার গিন্নীর কোল আলো করে জন্ম নিয়েছেন এক শিশু। রংপুরের শ্বশুর বাড়িতে রয়েছেন তার স্ত্রী। জনক হবার সংবাদ নিয়ে আব্বাস গেলেন নজরুলের কাছে। তাকে দিলেন সুসংবাদটা।

—ছেলের নাম কিন্তু আপনাকেই রাখতে হবে, কাজীদা।

—নাম রাখবো, মিষ্টি কই ? যাও, দুই খিলি পান নিয়ে আসো।

পান খেতে খেতে কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করলেন নজরুল। তারপর বললেন,–ছেলের নাম রাখলাম মোস্তফা কামাল।

—মোস্তফার অর্থ বুঝলাম। কিন্তু তার সাথে কামাল কেন ?

www.pathagar.com

—তুরস্কের কামাল পাশার নাম শুনেছো নিশ্চয়। তুরস্কের মুসলমানদের প্রাণে নতুন জোয়ার এনেছে সে। আমাদের কামাল এদেশের মানুষের মনেও নতুন প্রেরণা সঞ্চার করবে। দেশের অবিচার, অনাচার দলিত মথিত করে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে ন্যায় ও সত্য।

অনেক বছর পরে নজরুলের এই আশাবাদ সত্যে পরিণত হয়েছে। ব্যারিস্টারী পাশ করে মোস্তফা কামাল আইনজ্ঞ হিসেবে তার জীবন শুরু করেন। দেশের অবিচার, অনাচার দূর করার জন্য পেশাগত জীবনে তিনি ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। জীবনে সাফল্য লাভের ধাপে ধাপে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার প্রধান আসনটি তিনি অলংকৃত করেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির পদ হতে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন।

ফিরে যাই আগের কথাতে। সামান্য টাকা হাতে করে জসিমউদ্দীন এলেন কোলকাতায়। থাকার ব্যবস্থা হলো আব্বাসদের সাথে। মুসলমানদের এই দুর্দিনে আব্বাস চাইলেন জসিমউদ্দীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তার লেখা পল্লী গীতিগুলো সুর করা হলো। সেগুলো গেয়ে বেড়াতে লাগলেন তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। সাথে থাকেন গোলাম মোস্তফা আর জসিমউদ্দীন। বাংলার এই তিন দিকপাল একে অন্যকে উঠিয়ে নেয়ার কতোই না চেষ্টা।

পল্লীগীতিকে বেশ কিছুটা জনপ্রিয় করে আব্বাস ধরলেন গ্রামোফোন কোম্পানীর ম্যানেজারকে। দুইটা পল্লীগীতি রেকর্ড করতে হবে।

—ইসলামী গান ছেড়ে আবার পল্লীগীতি কেন ?

—নজরুলের লেখা ভাওয়াইয়া গান দুটো ভালোই কাটতি হয়েছে। পল্লী গীতির সুর ওই একই ধরনের। এটাও বাজার পাবে। যুক্তি দিলেন আব্বাস উদ্দীন।

—দেখি খাতাটা।

জসিমউদ্দীন আগ্রহের সাথে বাড়িয়ে ধরলেন তার গানের খাতাটি। ম্যানেজার বাবু তা দেখলেন উল্টে পাল্টে। শেষে বললেন,–আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এই গান শহরে চলবে না।

—শহরে না চলুক, গ্রামে তো চলবে। আব্বাসও নড়তে চাইলেন না তার অবস্থান থেকে।

—দেখুন, আমরা লোকসান দেওয়ার জন্য কোম্পানী খুলিনি। গ্রামের গান তাও আবার মুসলমান গীতিকারের লেখা। গীতিকার পরিচিত নন মোটেও। এই গান বাজারে ছেড়ে বদনাম কুড়াতে চাই না।

www.pathagar.com

—আমাকে দিয়ে আপনারা অনেক গান রেকর্ড করেছেন। তা বিক্রি করে কোম্পানী আয় করেছে মোটা অংকের টাকা। আমি এখনো ফুরিয়ে যাইনি। কাজেই আমার আবদারটা রাখতে হবে। নইলে চুক্তিভঙ্গ করবো। চলে যাবো অন্য কোম্পানীতে।

ম্যানেজার বাবু দেখলেন ভারি বিপদ। আব্বাস অন্য কোম্পানীতে চলে গেলে ব্যবসায়ে লালবাতি জ্বলবে তাদের। কিছুতেই চটানো যাবেনা আব্বাসকে।

জসিমউদ্দীনের দুইটি গান রেকর্ড করা হলো। 'আমার গহীন গাঙের নাইয়া' এবং 'ও আমার দরদী আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না'।

গান দুইটা বাজারে আসতেই অসম্ভব রকম জনপ্রিয়তা পেলো। বিক্রি হতে লাগলো হু হু করে। এর কারণ হলো, কোলকাতা শহরের শতকরা আশি ভাগ লোকের বাড়ি গ্রামাঞ্চলে। এদের মধ্যে আবার সিংহভাগ এসেছেন পূর্ব বাংলা থেকে। আঞ্চলিক ভাষার গান দুখানা পেয়ে তারা থমকে দাঁড়ালো। এই গানের সুরের বন্ধন যে তাদের নাড়ীর সাথে।

আব্বাসের সাথে জসিমউদ্দীনের নামও ছড়িয়ে পড়লো বাংলার হাটে মাঠে ঘাটে। অখ্যাত এক দরিদ্র যুবক জসিমউদ্দীন রাতারাতি খ্যাতির শীর্ষে উঠে এলেন। রেকর্ডিং কোম্পানীর লোকেরা ছুটতে লাগলো তার পেছনে। গানের উপর রয়েলটি প্রথা চালু হওয়ায় কোম্পানীর নিকট হতে সম্মানীর টাকাও বাড়তি হারে পেতে থাকলেন তিনি।

বাংলার মানুষ পেলো আরেক আব্বাসউদ্দীনকে। জসিমউদ্দীনকে দিয়ে তিনি গান লেখাতে লাগলেন। নিজে দিলেন তাতে সুর আর কণ্ঠ। সুরের বিষয়ে গোলাম মোস্তফাও সাহায্য করতে লাগলেন। এইভাবে একের পর এক রেকর্ডিং হতে লাগলো 'আমার হাড় কালা করলাম রে' 'প্রাণ সখিরে ঐ শোন ঐ কদম্বতলে' 'আমায় ভাসাইলি রে আমায় ডুবাইলি রে' 'মনই যদি নিবিরে বন্ধু' 'আমার এতো রাতে কেনে ডাক দিলি' 'নাও ছাড়িয়া দে' ইত্যাদি গানগুলো। এইভাবে অল্প দিনের ব্যবধানে পল্লীকবি জসিমউদ্দীনকে সুধিজনের দরবারে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সাথে সাথে আর্থিকভাবেও প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন তাকে কোলকাতা শহরে।

ছেলে মোস্তফা কামাল হাঁটতে শিখেছে। কাজীদা বড় আশা করে তার নাম রেখেছেন। তাকে ছেলে দেখাতে হয়। তাছাড়া কোলকাতা শহরে আব্বাস উদ্দীন এতো প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, সম্মান পেয়েছেন তার অংশ ভাগ করে দিতে চান পরিবারের মাঝে। তাই কিছুদিনের জন্য কোলকাতায় কড়েয়া রোডে একটা বাসা ভাড়া করলেন। স্ত্রী এবং পুত্রকে এনে উঠালেন সেখানে।

www.pathagar.com

দিনগুলো বেশ মধুর কাটতে লাগলো। আব্বাস এখন আর ব্যস্ত শিল্পী নন, ব্যস্ত গৃহকর্তা। মুসলমানের ঘরে গৃহপরিচারিকা পাওয়া যায় না। আব্বাস সাহায্য করেন স্ত্রীকে। বিকেলে ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ান গড়ের মাঠে। একদিন ছেলেকে নিয়ে গেলেন কাজী নজরুল ইসলামের বাসাতে।

—মোস্তফা কামাল তো বীরের বেশে আসবে, কোলে চড়ে কেন ? ঠাট্টা করলেন নজরুল।

—বীরের বেশেই এসেছে। তিন বছর বয়স না হতেই মুখস্থ করে ফেলেছে আপনার গান। বীর নয় ?

—বেশ তো বীর পুরুষ, গেয়ে শোনাও না একখানা।

নজরুলের বড় বড় ডাগর চোখ আর বাবরি চুল দেখে আগেই ভয় পেয়েছে শিশু কামাল। তারপর গান শোনাবার ফরমায়েশ। কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা।

ছেলেকে সাহস যোগালেন আব্বাসউদ্দীন। বললেন,–গাও না ওই গানটা–ত্রি ভূবনের প্রিয় মোহাম্মদ---

মোস্তফা কামালের প্রিয় গান এটি। মানে বোঝেন না। কিন্তু সুর তার ভারি পছন্দ। তাই গেয়ে উঠলেন,

ত্রি ভূবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলোরে দুনিয়ায়
আয়রে ছাগল আকাশ বাতাস দেগবি যদি আয়।

হাসিতে ফেটে পড়লেন নজরুল। শিশুকণ্ঠে সাগরের জায়গায় ছাগল বলাটা অপূর্ব শোনালো তার কানে। কামালকে কোলে তুলে নিলেন। পিতৃস্নেহে সিক্ত করলেন তাকে।

এদিকে কোলকাতায় চলচিত্র শিল্প শুরু হয়েছে। সিনেমার নায়ক নায়িকাদের অভিনয়ের সাথে সাথে গানও গাইতে হয়। শিল্পীকে দিয়ে পূর্বাহ্নে গান রেকর্ড করে নায়ক নায়িকাদের ঠোঁট মেলানোর রেওয়াজ তখন উদ্ভাবন হয়নি। আব্বাসউদ্দীনের চেহারা সুন্দর ও ভালো গান গাইতে পারেন দেখে তার এক বন্ধু বললেন সিনেমায় অভিনয়ের সাথে গান গাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিতে।

কথাটা আব্বাসের মনে ধরলো। ভাবলেন, কণ্ঠের মাধ্যমে তিনি বাংলার ঘরে ঘরে বেশ পরিচিতি পেয়েছেন। সিনেমায় একটা গানের দৃশ্যে অভিনয় করার সুযোগ পেলে তার পরিচিতিটা আরো বাড়তো। এই ভেবে দেখা করলেন তিনি সিনেমার প্রযোজক জয় নারায়ণ বাবুর সাথে। তার চেহারা দেখে ও কণ্ঠ শুনে 'বিষ্ণুমায়া' নামক একটা সবাক ছবিতে একটা গানের দৃশ্যে তাকে অভিনয় করতে দেওয়া হলো। ভালোভাবেই উৎরে গেলেন তিনি। তারপর 'ঠিকাদার'

www.pathagar.com

ছবিতে একটা গানের দৃশ্যে অভিনয় করার সুযোগ এলো। কিন্তু এখানেই বাধলো বিবাদ।

সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে আছে। সিনেমাটির পরিচালক শিশির বাবু একদিন কান্নাভেজা চোখ নিয়ে আব্বাসকে বললেন,–গানের দৃশ্যটা মনে হয় আপনাকে দিয়ে করানো গেলো না।

—কোনো আপত্তি এসেছে কি ?

—ঠিক তাই। আপত্তির হোতা যিনি টাকা খাটিয়েছেন এই ছবিতে। তার বক্তব্য, ছবিটা হচ্ছে রামায়ণ যুগকে উপজীব্য করে। হিন্দু দর্শক ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের লোক এই ছবি দেখবে না। ছবিতে কৃষ্ণকে আহ্বান করে গান গেয়ে মঞ্চে নিয়ে আসতে হবে গায়ক হিসেবে আপনাকে। রামায়ণ যুগে মুসলমান 'আব্বাসউদ্দীন' এর অস্তিত্ব ছিল কি ? এটাই তার আপত্তি।

—এটা শুধু অভিনয়। নাম তো এখানে বড় নয়।

—তিনি ওটাকে বড় মনে করছেন। তাই আপনি যদি হিন্দু নামে অভিনয় করতে চান, পার্টটা হয়তো আপনাকে দেয়া যাবে।

—তা হয় না। ছবির জন্য বাপ-দাদার দেওয়া নামটা পাল্টাতে পারবো না। দরকার হলে সিনেমায় আর আসবো না।

আব্বাস সত্যি সত্যি তার কথা রাখলেন। বিভিন্ন ছবির প্রযোজক গানের দৃশ্যে তাকে অভিনয় করার প্রস্তাব দিতে লাগলো। নাম পাল্টিয়ে সে সুযোগ নিলেন না তিনি।

গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সেল রুম গম গম করছে লোকে। আজ বেশ কয়েকটি গান রেকর্ডিং হবে। সেই সাথে সাহিত্যিক-সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বেরের লেখা দুইটি নাটিকাও। গিরীন চক্রবর্তী গান শেখাচ্ছেন। এই সময়ে আব্বাসউদ্দীন ঢুকলেন ঘরে। তার গানও রেকর্ডিং আছে আজ।

আব্বাসউদ্দীনের পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী। সব সময় এই পোশাকই পরেন তিনি। মাথায় কিস্তি টুপি। পাঞ্জাবীর ঝুল একেবারে হাটুর নিচ পর্যন্ত। পাশের মসজিদ থেকে আসরের নামাজ পড়ে এখানে এসেছেন।

—মসজিদে ইমামতী করে এলেন নাকি ? সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন মোহাম্মদ মোদাব্বের।

—আব্বাস ইমামতী করার রিহার্সেল দিতে এসেছে হয়তো। কৌতুকের সাথে মন্তব্য কাজী নজরুলেরও।

পরনের পোশাকের কথা যখন উঠেছে আব্বাস আর চুপ থাকতে পারলেন না। তার পাজামা-পাঞ্জাবী পরা নিয়ে এ পর্যন্ত বহু কথা তাকে শুনতে হয়েছে।

www.pathagar.com

কতোজন সাহেবী পোশাক পরার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে তাকে। তিনি কান দেননি। তার রুচিতে বেঁধেছে বিজাতীয় পোশাক পরিধান করা। বেশ-ভূষায় তিনি একজন খাঁটি বাঙালী ও সেই সাথে একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে থাকতে চান। তাই তিনি বললেন,–ইমামতীর রিহার্সেল দিচ্ছি না। দিচ্ছি একদিন কঠিন মাটির নিচে যে যেতে হবে তার রিহার্সেল। মুসলমান হিসেবে জন্ম নিতে পেরেছি বলে আল্লাহর কাছে হাজার কৃতজ্ঞতা। মুসলামান মৃত্যুতে বিশ্বাস করে, কবরের আযাবকে বিশ্বাস করে। কবরে যখন শুইয়ে দেওয়া হবে এই সাদা পোশাকই থাকবে পরিধানে।

— সেটা যথাসময়ে তোমাকে পরিয়ে দেওয়া হবে। চিন্তার কিছু নেই। ফোড়ন কাটলেন নজরুল।

— দু'দিন পরেই যখন পরতে হবে দু'দিন আগে তা পরতে ক্ষতি কি ? আব্বাস তার যুক্তিতে অটল।

ভারতবর্ষে তখন শুরু হয়েছে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল কথা হলো, বেনিয়া বৃটিশ শাসক দুইশত বছর ধরে এদেশে শাসন করেছে। শোষণ করেছে বহুমাত্রিক। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করেছে। এমনকি ধর্মীয় ব্যাপারেও তারা তাদের খ্রীষ্ট ধর্মকে প্রচার প্রসারের জন্য চার্চ প্রতিষ্ঠাসহ নানাবিধ প্রতিষ্ঠান খুলেছে। এদেশের দুই প্রধান গোষ্ঠী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছে দ্বন্দ্ব। তাই বৃটিশকে তাড়াতে হবে এদেশ থেকে।

বৃটিশের অধীনতা থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলনে নেমেছেন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সচেতন মানুষ। বেশ আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'যুগান্তর' আর 'অনুশীলন' গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর অনুসারীদের একটি মাত্র কর্মসূচী। তা হলো সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বেনিয়া বৃটিশ সরকারের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা। স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা।

অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী নেতারাও সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতারা দেশের স্বাধীনতা চান। কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে পাহাড়সম ব্যবধান। হিন্দু নেতারা চান, সমগ্র ভারতবর্ষ একটিমাত্র রাষ্ট্রীক শাসনের অধীনে থাকুক। কিন্তু মুসলমানরা চান তাদের জন্য পৃথক আবাসভূমি। বৃটিশ ভারতে হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজদের নিকট হতে সব রকম সুযোগ সুবিধে ভোগ করে এসেছে। মুসলমানরা ইংরেজদের

www.pathagar.com

নিকট বরাবরই হয়েছে উপেক্ষিত। হিন্দুরাও তাদের মনে করেছে রেফিউজী। মুসলমানদের আদিবাস এদেশে নয়, যেন আরবদেশে।

ভারতে বাস করে আট কোটি মুসলমান। তাদের দাবী আদায় করার জন্য রাজনৈতিক নেতারা লড়ছেন। কিন্তু তাদের কর্মকান্ড মূলত কোলকাতা শহরেই সীমাবদ্ধ। গ্রামে যে বিপুল মুসলিম জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের ঘুম ভাঙ্গায় কে ? সংগীতের মাধ্যমেই এটা করা যেতে পারে। একদিন কথা প্রসঙ্গে আব্বাস নজরুলকে বললেন,–কাজীদা, মুসলমান শ্রোতারা এখন আপনার খাঁটি শ্রোতা হয়ে পড়েছে। তারা আপনাকে আর অশ্রদ্ধা করে না।

—কি বলতে চাও, খুলে বলো।

— যুগান্তর অনুশীলন দল হলো। বৃটিশের বিরুদ্ধে তারা সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত আছে। কিন্তু এই সমস্ত দলে মুসলমান যুবকদের স্থান নেই। স্বাধীনতার জন্য রক্ত তাদেরও টগবগ করে ফুটছে। তাদের উদ্দীপনা যোগাতে হবে।

—কোন সশস্ত্র দল গঠনের প্রস্তাব এনেছো কি ?

—সৈনিক জীবনের কথা মনে হয় আপনি ভুলেননি। আমি ওই পথে যাচ্ছি না। এদেশের মুসলিম যুব শক্তির জন্য গান লিখতে হবে। তাদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে হবে। তারা জানুক, তারাই ছিল এদেশের শাসনকর্তা। মুসলমানরা রাজা-বাদশার জাত।

—গান লেখা যাবে। কিন্তু কোম্পানী রেকর্ড করবে তো ?

—রেকর্ড কোম্পানীর হুস ফিরেছে। আপনার কথা আর আমার কণ্ঠ হলে যে কোনো গান নিতেই তারা প্রস্তুত।

নজরুল এবার মন দিলেন যুব শক্তির দিকে। এক এক করে তিনি রচনা করলেন 'বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা' 'জাগে না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান' 'দিকে দিকে পুন জ্বলিয়া উঠিছে' 'কারার ঐ লৌহ কপাট' হত্যাদি গানগুলো। নজরুলের এই কওমী গানগুলো আব্বাসউদ্দীন বলিষ্ঠ কণ্ঠে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাইতে লাগলেন। এই গান ঘুমন্ত মুসলিম জীবনে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগালো। এই সব গানের মাধ্যমে মুসলমান যুবকরা গৌরবময় অতীতের ঐতিহ্য চেতনায় জাগ্রত হলো। বৃহৎ মুসলিম জগতের পটভূমিতে নিজেদের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলো। তার সাথে সাথে গভীর রাজনৈতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হলো তারা। মুসলিম যুবকদের রাজনৈতিক জাগরণে নজরুলের পাশাপাশি আব্বাসও অবদান রাখতে পেরে নিজেকে গৌরাবন্বিত বোধ করলেন।

www.pathagar.com

আব্বাসউদ্দীনের কর্মস্থল রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বিধায় গান রেকর্ডিং এবং অন্যান্য বিষয়ে বাড়তি সুবিধে পাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে সরকারী সিদ্ধান্তে অফিসটি স্থানান্তরিত হলো শহর থেকে অনেক দূরে, আলীপুরে। এতে আব্বাসের বেশ অসুবিধা সৃষ্টি হলো। আবার অফিসের বড়কর্তা পরিবর্তন হয়েছে। যদুনাথ সরকার নতুন দায়িত্ব নিয়ে চলে গেছেন অন্যত্র। আগের মতো অফিস থেকে সেই বদন্যতা তিনি আর পান না।

এর মধ্যে এলো পূজার ছুটি। পূজার ছুটির সাথে আরো পনোরো দিনের ছুটি চেয়ে আব্বাস দরখাস্ত পেশ করলেন। দরখাস্ত পেয়ে ডাক পড়লো তার বড়কর্তার ঘরে।

—আপনি তো মুসলমান। পূজার ছুটিই তো আপনার জন্য যথেষ্ট। এর সাথে আরো পনেরো দিন ছুটি চেয়েছেন কেন ? আপনিও পূজা করবেন নাকি ?

খোঁচাটা সহ্য করলেন আব্বাসউদ্দীন। নরম সুরে বললেন,–স্যার, এই সময় প্রতি বছর আমি ছুটি নিয়ে থাকি। আমার দেশের বাড়ি কোলকাতা থেকে তিনশো মাইল দূরে। সেখান থেকে পরিবার নিয়ে আমি দার্জিলিং যাই হাওয়া পরিবর্তনের জন্য।

—হাওয়া পরিবর্তন ? শখ মন্দ নয়। আমি এতো বড় চাকরি করেও এক বার সাহস পেলাম না হাওয়া পরিবর্তনের জন্য দার্জিলিং যেতে। আর পঞ্চাশ টাকা বেতনের কেরানী যাবেন হাওয়া পরিবর্তনে। যান, কোনো ছুটি হবে না।

'পঞ্চাশ টাকার কেরানী' কথাটা শুনে আব্বাসের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠলো। বড়কর্তার সাথে কথা বলার রুচিই হারিয়ে ফেললেন তিনি। বাইরে এসে আবারো একটা ছুটির দরখাস্ত লিখলেন তিনি। সেটা হেড এ্যাসিসটানের টেবিলে রেখে সোজা চলে গেলেন কুচবিহারে। সেখান থেকে দার্জিলিং।

অফিসের বড় কর্তাটি বড় পরিবার থেকে আসেননি। তাই অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাও তার মধ্যে নেই। আব্বাসউদ্দীনের সুনাম আদপেই সহ্য হচ্ছিল না তার গোড়া থেকে। আব্বাস নজরুলকে দিয়ে গান লেখাচ্ছেন, নিজে কণ্ঠ দিচ্ছেন আর এইসব ইসলামী জাগরণমূলক গান প্রচার করে মুসলমানদের তুলছেন জাগিয়ে। এখন পৃথক একটা বাসভূমির দাবী করছে তারা। বড়কর্তার দৃষ্টিতে, যতো অনাসৃষ্টির মূলে এই আব্বাসউদ্দীন। তার উপর রাগের এটাই কারণ।

দার্জিলিং এসে প্রকৃতির মতোই আব্বাসের মন বিগলিত হলো। ভাবলেন, আসার সময় বড় কর্তাকে চটিয়ে আসা ঠিক হয়নি। তাই বড় কর্তার রাগ প্রশমিত করার জন্য খুব কাব্যিক ভাষায় সুন্দর একটা চিঠি লিখলেন। পাঁচ পাতায় বর্ণনা করলেন দার্জিলিংয়ের দৃশ্যাবলী।

www.pathagar.com

দার্জিলিং থেকে ফিরে আব্বাস যোগদান করলেন কাজে। তার উপস্থিতির খবর পেয়ে বড়কর্তা ডেকে পাঠালেন তাকে।

—ছুটি মঞ্জুর না করিয়ে কেন গেলেন আপনি ? ঘরে ঢুকতেই বাজখাই গলায় প্রশ্ন করলেন বড়কর্তা।

—স্যার, তখন আপনার মেজাজ ভালো ছিল না। ওদিকে আমার সবকিছু তৈরি। তাই দরখাস্ত রেখে গিয়েছিলাম। মনে করেছি, রাগ পড়ে এলেই আপনি ছুটি মঞ্জুর করবেন।

—আমার মেজাজ খারাপ ? কি দুঃসাহস আপনার। তারপর আমাকে আবার ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছেন কোন সাহসে ? গর্জন করে উঠলেন বড়কর্তা।

আব্বাস নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলেন না। ছুটিতে যাবার সময় কেরানী বলে গাল দিয়েছেন। আজ আবার ব্যক্তিগত চিঠির কথা উঠিয়ে জবাবদিহি চাইছেন। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন আব্বাসউদ্দীন। দরকার নেই এই চাকরির ? তাই বড়কর্তাকে বললেন,–আপনার সৌভাগ্য আব্বাসউদ্দীনের নিকট থেকে পাঁচ পাতার চিঠি পেয়েছেন। যত্ন করে রেখে দেবেন চিঠিটা। আপনার কাজে দেবে। ভবিষ্যতে আপনার বংশধরদের বলতে পারবেন, আব্বাসউদ্দীনের চিঠি আছে আমাদের কাছে।

—হোয়াট ? সাহেব একেবারে ফেটে পড়লেন রাগে। আব্বাস সটান চলে এলেন নিজের রুমে। মুহূর্তে লিখে ফেললেন ইস্তফাপত্র। আবার ঢুকলেন সাহেবের রুমে। সেখানা সাহেবের টেবিলের উপর রেখে বললেন,–বারো বছরের দাস জীবনের যবনিকা টেনে দিলাম।

রাগের মাথায় চাকরি ছাড়লেন। উপকারই হলো আব্বাসউদ্দীনের। সময় পেলেন অফুরন্ত। এর আগে গান নেওয়ার জন্য নজরুলের পিছনে সময় অভাবে কিউ দিতে পারছিলেন না। ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, কানন দেবী, কমলা ঝরিয়া, ধীরেন দাস, কমল দাস গুপ্ত, মৃণাল কান্তি ঘোষ সবাই গানের জন্য নজরুলের কাছাকাছি থাকেন সর্বক্ষণ। চাকরি করে আব্বাসউদ্দীনের কষ্টই হচ্ছিল। সুযোগ করে উঠতে পারছিলেন না। এবার সময় ও সুযোগ দুটোই হলো। আব্বাস কবির সাথে সাথেই রইলেন। ইসলামী গান, দেশের গান, যুবকদের দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করা যায় এমন গান লিখিয়ে নিতে লাগলেন কবিকে দিয়ে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাটিয়ালী ও ভাওয়াইয়া গান গেয়ে বেড়ানো তো রয়েছেই।

জয়পুরহাট থেকে আসা কয়েকজন যুবক দেখা করলো আব্বাসউদ্দীনের সাথে। তাদের একটা অনুষ্ঠানে গান গাইতে যেতে হবে। এখন আর চাকরির

www.pathagar.com

বন্ধন নেই। দেশভ্রমণ আব্বাসের নেশার মতো। নতুন জায়গা দেখা হবে এই আশাতে আব্বাস রাজী হয়ে গেলেন।

এলেন জয়পুরহাট। ভালোই লাগলো তার। এই গ্রাম, এই শহর। ঠিক তার কুচবিহারের মতো। সন্ধ্যার পর অনুষ্ঠান বলে তিনি ঘুরে ঘুরে দেখছেন শহরটিকে। একজন যুবক যেচে পরিচিত হলো তার সাথে। এক সময় সে যুবকটি বললো,–দেখুন, কোলকাতা থেকে এসেছেন। এখানকার সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে আপনার ধারনা না থাকারই কথা। আপনি কিন্তু বিপদে পড়তে পারেন।

—কি ধরনের বিপদ ? জানতে চাইলেন আব্বাসউদ্দীন।

— এখানে লা-মাজহাবীর সদস্য বেশি। এরা অতিমাত্রায় মুসলমান। হারমোনিয়াম বাজিয়ে তারা আপনাকে গান গাইতে দিবে না। তবলা বাজানোর প্রশ্নই ওঠে না। একটা হট্টগোল বাধিয়ে ছাড়বে।

— তুমি উপকারই করেছো আগে থেকে আমাকে কথাটা বলে। আমিও মুসলিম পরিবারের ছেলে। ওদের আমি অশান্ত হতে দেবো না।

সন্ধ্যার পরেই শুরু হলো অনুষ্ঠান। চারদিকে অসংখ্য জনতা। আব্বাস উঠলেন মঞ্চে। সালাম জানালেন দর্শকদের। তারপর বললেন,–আমি মুসলিম পরিবারের ছেলে। নামাজ ঠিক মতো আদায় না করলে আমাদের বাড়িতে ভাত বন্ধ। আমি এখানে এসেছি দু'চারটা কথা বলতে। ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত দিতে আসিনি।

—আপনি খালি গলায় গান গাইলে আমাদের আর আপত্তি নেই। সভার মধ্য থেকে বললো একজন।

—কে বলেছে আমি গান গাইবো ? আমি শুধু দু'চারটা কথা বলবো। তাও নবী রাসুলদের কথা। তেরোশো বছর আগে আমাদের মহানবী যখন দুনিয়াতে এলেন তখন কেমন ছিল আরব জাহানের অবস্থা ? আকাশ বাতাস কি তার আগমন বার্তা ঘোষণা করেনি ?

—করেছিল। সমস্ত দুনিয়া তার আগমনে হয়েছিল মাতোয়ারা। দর্শকরা সমর্থন জানালেন আব্বাসের কথাতে।

শুনুন তা হলে—

তোরা দেখে যা আমেনা মায়ের কোলে
মধু-পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে–
যেন ঊষার কোলে রাঙা রবি দোলে।

—শুনতে চান কি আপনারা এই জিনিস ?

www.pathagar.com

—শুনতে চাই। আপনি চালিয়ে যান। সভার মধ্য থেকে চিৎকার উঠলো।

আব্বাসউদ্দীন এবার হারমোনিয়ামটা টেনে নিলেন। বললেন,–এই ধরনের কথাগুলো আমি আরো একটু সুন্দর করে বলতে চাই। সুরে সুরে বলতে চাই। এবার ধরলেন তিনি নজরুলের লেখা–

আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়।
আমার কিসের শঙ্কা
কোরআন আমার ডঙ্কা
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়।

জনতা এবারে সুর মেলালো আব্বাসউদ্দীনের সাথে। তিনি এটাই চাচ্ছিলেন। জনতাকে আনতে পেরেছেন নিজের আয়ত্তে।

এবার আব্বাস জনতার উদ্দেশ্যে বললেন,–দেখুন, গোশ রান্না করতে অনেক মশলা লাগে। এর মধ্যে লবনও একটা। আমি যে গান শুরু করেছি এতে একটু লবনও দরকার। এই বলে তিনি তবলচিকে ডাকলেন। তারপর গান ধরলেন–

আমার মোহাম্মদের নামের ধেয়ান
হৃদয়ে যার রয়
খোদার সাথে হয়েছে তার
গোপন পরিচয়।

আব্বাস গান শেষ করলেন। কিন্তু শ্রোতারা গান শোনা শেষ করতে চান না। আব্বাস দেখলেন, যারা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইতে আপত্তি জানাচ্ছিলেন তারাই এখন তার সমঝদার শ্রোতা। পুলকিত হয়েছে তারাই বেশি। আব্বাসকে তারা আর কোলকাতাতে ফিরতে দিতে চায় না। বাধ্য হয়ে আরো একদিন থাকতে হলো তাকে জয়পুরহাটে।

জয়পুরহাট থেকে নতুন এক ধারণা নিয়ে ফিরলেন আব্বাসউদ্দীন। অবহেলিত জনপদের মুসলমানরা অনেক পিছিয়ে আছেন। ধর্মীয় গোড়ামির কারণে গান শুনলে আজো তারা কানে আঙ্গুল দেয়। শিক্ষার আলো ছড়াতে হবে তাদের অন্তরে। ইসলামের মর্মবাণী শোনাতে হবে তাদের। ভাবলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠানে গান গাইবার দাওয়াত এলে তিনি অবশ্যই হাজির হবেন। ধর্মীয় গোড়ামিকে দূর করার চেষ্টা করবেন।

আব্বাসের কর্মক্ষেত্র কোলকাতায়। কিন্তু মন পড়ে রয়েছে তার নিজ জেলা কুচবিহারে। কুচবিহারের মহারাজা একটা সভার আয়োজন করলেন। উদ্দেশ্য,

www.pathagar.com

—কিন্তু সমস্যা হলো তার গলাতে। মল্লিক মশায়ের গলার যে টানটা এটা কিছুতেই যাবে না। রেকর্ড বাজলেই তিনি ধরা পড়ে যাবেন। তবুও বিষয়টা নিয়ে তুমি ভগবতী বাবুর সাথে কথা বলতে পারো।

আব্বাস এবার ধরলেন ভগবতী বাবুকে। শুনেই তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। রাজী করানো গেলোনা তাকে কিছুতেই।

ভগবতী বাবুর জ্বলে উঠাটা বেশিদিন স্থায়ী হলো না। হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ধরাধাম ত্যাগ করলেন তিনি।

ভগবতী বাবুর জায়গায় এলেন হেমচন্দ্র সোম। বীমা কোম্পানীর দালাল এর মতো আব্বাস লেগে রইলেন তার পেছনেও। একদিন সুযোগ বুঝে কথাটা তিনি পাড়লেন সোমবাবুর কাছে। শুনেই সোম বাবু বললেন,–বেশ তো। মল্লিক মশাই বুড়ো হয়েছেন। গ্রামোফোন কোম্পানী লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেছে তাকে দিয়ে। এখন যদি তিনি ইসলামী গান গেয়ে আনন্দ পেতে চান অবশ্যই তাকে গাইতে দেওয়া হবে।

খবরটি শুনে কাজী নজরুল ইসলাম ও মল্লিক সাহেব কতোই না খুশি হলেন। নজরুল তখনই লিখতে বসলেন দুইটা গান। কে, মল্লিকের কাছে তিনিও কম কৃতজ্ঞ নন।

জয়পুরহাটের অনুষ্ঠানে আব্বাসের হৃদয় উজাড় করা গান শুনে এবারে দাওয়াত এলো দিনাজপুর থেকে। সাথে রয়েছেন শচীন দেব বর্মণ। তিনি নজরুলের আধুনিক গান গেয়ে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। দুই শিল্পীর একই ঘরে থাকার ব্যবস্থা হলো। এই অনুষ্ঠানের জন্য দুই দিন তাদের থাকতে হলো দিনাজপুর শহরে। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন আব্বাস গাইলেন এই এলাকার ভাওয়াইয়া গান। এই গান ভারি পছন্দ হলো শচীন দেব বর্মণের। পুকুরে গোসল করতে যেয়ে, বেড়াতে যেয়ে এমনকি ঘুমাবার আগেও তাকে শোনাতে হয় 'ও মোর কালা রে কালা'। আব্বাস বিরক্ত হন না। বরং বিখ্যাত এই শিল্পীর আগ্রহ দেখে অবাক হন। এতো আন্তরিকতা না থাকলে কি তিনি এতো বড় শিল্পী হতে পেরেছেন ?

গায়ক হিসেবে আব্বাসউদ্দীনের নাম ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামে গঞ্জে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক আসে গান শোনাবার। টাঙ্গাইল থেকে একদল যুবক এসে তাকে দাওয়াত করলো। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ প্রতিষ্ঠিত কলেজের সাহায্যার্থে তাকে যেতে হবে সেখানে। অংশ নিতে হবে একটি অনুষ্ঠানে।

আব্বাস সানন্দে রাজী হলেন। একজন শিক্ষাবিদ নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একটি কলেজ। মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের কাজে তিনিও কিছুটা অংশ নিতে পারবেন-এটা বা কম কিসে।

www.pathagar.com

আব্বাসউদ্দীন এসে পৌঁছলেন দুপুরের দিকে। অনুষ্ঠান হবে সন্ধ্যায়। খাওয়া দাওয়ার পণ্ডে তিনি একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। এমনি সময়ে আয়োজকদের একজন এসে বললো,–স্যার, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। জলসা বুঝি ভন্ডুল হয়।

—কি হয়েছে বুঝিয়ে বলো।

— আপনার ইসলামী গান শুনবে বলে দূর-দূরান্ত হতে হাজির হয়েছে হাজার হাজার লোক। এখনো লোক আসছে। এর মধ্যে কে যেন রটিয়ে দিয়েছে, আব্বাসউদ্দীনের মুখে দাড়ি নেই।

—রটাতে যাবে কেন ? সত্যিই তো আমি দাড়ি রাখিনি।

— সেটাই হয়েছে বিপদ। আমাদের বিরুদ্ধ পার্টির একদল ছাত্র রটিয়ে বেড়াচ্ছে, দাড়িবিহীন গায়কের নিকট হতে তারা ইসলামী গান শুনবে না, শুনতেও দিবে না।

— কিছুই হবে না। তোমাদের মাইক ঠিক হলে মাগরেবের নামাজের আগে আমি মাইকের সামনে দাঁড়াবো। দু'চারটা কথা বলবো।

তাই হলো। মাগরেবের নামাজের আগে আব্বাসউদ্দীন মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। দেখতে পেলেন, চারদিকে শুধু লোক আর লোক। তখনকার দিনেও প্রায় ষাট সত্তর হাজার লোকের সমাবেশ ঘটেছে। পূর্ব বঙ্গের এই মুসলমান জনতা এতোদিন আব্বাসউদ্দীনের ইসলামী গান শুনে এসেছেন শুধু রেকর্ডের মাধ্যমে। সেই শিল্পীকে সামনা সামনি দেখার জন্য কেউ আর ঘরে নেই। রীতিমতো একটা উৎসবের বন্যা।

— ভাইসব, আমি আব্বাসউদ্দীন। মাগরেবের নামাজের পরে আমি আপনাদের গান শোনাবো। তার আগে আপনাদের একটা শর্ত পালন করতে হবে। যারা মাগরেবের নামাজ পড়বেন না, আব্বাসউদ্দীন তাদের গান শোনাবেন না। এই বলে আব্বাসউদ্দীন ঐ মাঠেই মাগরেবের নামাজ পড়াবার ব্যবস্থা করলেন। গৃহস্তের উঠানের খড় পরিণত হলো জায়নামাজে। বিরাট আকারে জামাতও অনুষ্ঠিত হলো।

নামাজ শেষে আব্বাস গান গাইতে উঠলেন। এতো বড় সভায় গান গাইবার সৌভাগ্য তার আগে হয়নি। আল্লার কাছে কৃতজ্ঞতায় চোখে পানি এলো তার। বড় করে জামাতে নামাজ পড়ানোতে বিরুদ্ধ দলেরও মুখে রা নেই। আব্বাস নজরুলের গান ধরলেন–

স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণা
এস মালোবিকা
অর্জুন মঞ্জুরী কর্ণে
গলে নীপ মালিকা।

www.pathagar.com

গানটি শেষ করে আব্বাসউদ্দীন বললেন,–কে কে গানের অর্থ বুঝতে পারেননি, হাত তুলুন।

আব্বাস দেখলেন, হাত তুলতে বাদ নেই কেউ। এবার তিনি তার আসল কথা বললেন,–ভাইসব, আমি আপনাদের মতো মুসলমান ঘরের ছেলে। নামাজ রোজা আমাকেও করতে হয়। কিন্তু এখনো দাড়ি রাখিনি বলে যারা আমাকে বয়কট করার কথা বলেছেন, তারা ঠিক বলেননি। মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করা সঠিক কাজ নয়।

এবারে আব্বাসউদ্দীন কয়েকটি ইসলামী গান গাইলেন। শ্রোতারা আপ্লুত হলো আবেগে। তারপর তিনি বললেন,–শুধু দাড়ি রেখে মুসলমান বলে পরিচয় দিলে চলবে না। আচার-আচরণেও একজন খাঁটি মুসলমান হতে হবে। মুসলমানদের আজ মহা দুর্দিন। আমাদের আলাদা একটা বাসভূমি দরকার। এর জন্য লড়তে হবে সকলকে। আর কতোদিন মার খাবে মুসলমানরা।

এর পরে আব্বাসউদ্দীন কয়েকটি ভাটিয়ালী আর ভাওয়াইয়া গান গাইলেন। প্রায় তিন ঘন্টার একক অনুষ্ঠান করলেন তিনি। সাহস আর আত্মবিশ্বাসের জোরে জয় করে নিলেন লক্ষ শ্রোতার অন্তর।

এ, কে ফজলুল হক জননেতা হিসেবে তখন বেশ নাম করেছেন। মুসলমানদের আপদে বিপদে ঝাপিয়ে পড়ছেন তিনি বাঘের মতো। অন্যান্য মুসলিম নেতার মতো তিনিও মুসলমানদের জন্য আলাদা একটা বাসভূমি গঠনের কাজে জনমত সৃষ্টি করে চলেছেন। ইংরেজদের বুঝাতে তৎপর হয়েছেন, শুধু কংগ্রেসের হাতে স্বাধীনতা দিলে চলবে না। মুসলিম লীগেরও দাবী আছে। একটা পৃথক ভূখন্ড তাদের চাই।

ভারতের স্বাধীনতা প্রদানের বিষয়ে লাহোরে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। এই বৈঠকে আমন্ত্রিত হয়েছেন ফজলুল হকও। মুসলমানদের জন্য পৃথক একটা আবাসভুমির দাবী তুলবেন তিনি। তেমন প্রস্তুতিই নিয়েছেন।

গোলটেবিল বৈঠকে যাবার আগে বাংলার বাঘ ফজলুল হক তার বাসায় একটা মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করলেন। তিনি তখন কোলকাতার বেনে পুকুর লেনে থাকেন।

পাগড়ী মাথায় বাঘা বাঘা মৌলভী সাহেবরা এসেছেন মিলাদ পড়াতে। নবী রাসুলদের বিভিন্ন কাহিনী শুনিয়ে তারা মিলাদ শেষ করলেন। তখনো বাতাসা বিতরণ হয়নি। হক সাহেব ঘরের ভিতর থেকে একটা হারমোনিয়াম নিয়ে হাজির

www.pathagar.com

হলেন মাহ্‌ফিলে। বললেন,–এবার আমরা আব্বাসউদ্দীনের মিলাদ পড়ানো শুনবো।

হারমোনিয়াম বাজিয়ে মিলাদ পড়ানোর কথা কেউ শুনেছে কখনো ? উপস্থিত পাগড়ীধারী মৌলভীরা তাই খুবই বিরক্ত হলেন। রীতিমতো অপমান বোধ করলেন। জুতা হাতে বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন তারা। কেউ কেউ বেরও হয়ে গেলেন।

হক সাহেব ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেও আমল দিলেন না। আব্বাসউদ্দীনকে বললেন,–ধরো তোমার মিলাদ।

আব্বাসউদ্দীন শুরু করলেন–

নাম মোহাম্মদ বোলরে মন নাম আহম্মদ বোল
যে নাম নিয়ে চাঁদ সেতারা আসমানে খায় দোল।
পাতায় ফুলে যে নাম আঁকা
ত্রিভূবনে যে নাম মাখা
যে নাম নিতে হাসীন উষার রাঙে রে কপোল।

এটা শেষ করে নজরুলের আরেকটা গান ধরলেন—

শোনো শোনো ইয়া ইলাহী
আমার মোনাজাত।
তোমারি নাম জপে যেন
হৃদয় দিবসরাত।

মৌলভীরা বেশি দূর যেতে পারেননি। আব্বাসের দরাজ কণ্ঠে মন ভুলানো এই গান শুনে ফিরে এলেন তারা ঘরে। দেখলেন এক অপূর্ব দৃশ্য। আব্বাস গান গাচ্ছেন আর তা শুনে ফজলুল হকের দু'চোখে পানি ঝরছে। মৌলভীরা এতোক্ষণ ওয়াজ করেও ফজলুল হকের চোখে পানি আনতে পারেননি। আব্বাস তা পেরেছেন।

বেশ লজ্জায় পড়ে গেলেন মৌলভীরা। গান শেষ হলে আব্বাসউদ্দীনকে 'ভাই' বলে তারা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সে দৃশ্য দেখে ফজলুল হক বললেন,–সব গান কিন্তু হারাম নয়। কিছু গান মুসলমানদের পরস্পরের সান্নিধ্যে আসতেও সাহায্য করে। আব্বাসউদ্দীন কিন্তু সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছেন।

—আর লজ্জা দেবেন না হুজুর। আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি। তারা বাতাসা নিলেন হাসিমুখে। তারপর হক সাহেবের সাফল্য কামনা করে বিদায় নিলেন তার নিকট হতে।

www.pathagar.com

শুধু যে গানের মাধ্যমে বাংলার বাঘকে আব্বাস কাঁদাতে পেরেছেন তা নয়। মাঠের কৃষক থেকে শুরু করে সমাজের বরেণ্য ব্যক্তিও তার গানে আনমনা হয়েছেন, চোখের পানি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। শ্যামবাজার এলাকায় এক স্কুলে সভা বসেছে। কোলকাতার বিখ্যাত সংবাদপত্র অমৃতবাজারের সম্পাদক তুষার কান্তি ঘোষ সভার সভাপতি।

সভার কাজ শুরু হলো। আব্বাসউদ্দীনের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে উদ্বোধনী সংগীত ও বিদায় সংগীত গাইবার জন্য। সভাতে উপস্থিত হয়ে আব্বাস উদ্দীন বুঝতে পারলেন, মূলত সভাটি ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা ও দলীয় কর্মীদেরই সভা। আব্বাসউদ্দীনের উপস্থিতি কিছুটা অসুবিধায় ফেলেছে তাদের।

সূচনা সংগীত গাইবার জন্য আব্বাস মাইক ধরলেন। বললেন,–আমার অন্য জায়গায় একটা অনুষ্ঠানে গান গাইবার দাওয়াত আছে। আপনারা যদি অনুমতি দেন তা হলে আমি পর পর দুইটা গান গেয়ে বিদায় নিতে পারি।

— তাই হোক। সম্মতি জানালেন আয়োজকরা। সত্যিই আব্বাসের উপস্থিতি অসুবিধায় ফেলেছিল তাদের।

উদ্বোধনী সংগীতের পরে আব্বাস ধরলেন একটি ভাওয়াইয়া গান 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে'।

গান শেষ হলো। আব্বাস দেখলেন সভাপতি তুষার কান্তি ঘোষ রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন। কান্না লুকাতে না পেরে দুচোখ লাল হয়ে গেছে তার। সভাপতি মঞ্চে এলেন। মাইক হাতে নিয়ে সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন,– আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আব্বাসউদ্দীনের গান আমাকে ছোটবেলার স্মৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। আমাকে করেছে মানসিকভাবে বিপর্যস্থ। এই সভার কাজ চালাবার মতো মানসিক অবস্থা আমার নেই। আমি আব্বাস ভাইকে নিয়ে চললাম বাইরে।

আব্বাসউদ্দীনকে নিয়ে এলেন তিনি তার পত্রিকা অফিসে। বেশ করে তাকে আপ্যায়ন করালেন। তার বৃহৎ পত্রিকা অফিসটির প্রতিটি ইউনিট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন নিজে সাথে থেকে। একটা পত্রিকা প্রকাশনার জন্য এতো লোকের যে পরিশ্রম করতে হয় আব্বাসের আগে তা ধারণাই ছিল না। শেষে আব্বাসকে তিনি গাড়ি করে পৌঁছে দিলেন তার ডেরাতে।

কোলকাতাতে রেডিও সেন্টার চালু হয়েছে। আব্বাসউদ্দীন যোগাযোগ করলেন অল ইন্ডিয়া রেডিওর কোলকাতা স্টেশনের ডিরেক্টর নৃপেন মজুমদারের

www.pathagar.com

সাথে। মজুমদার বাবু তাকে গান গাইবার সুযোগ করে দিলেন। কিন্তু সম্মানী জুটলো না ভাগ্যে।

তাতেই খুশি আব্বাসউদ্দীন। রেডিওর মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ শুনছে তার কণ্ঠ। এটাই বা কম কিসে। তাছাড়া যন্ত্রী এবং কলা-কুশলীদের সাথে তার একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠার সুযোগ হয়েছে এই সুবাদে।

রেডিওতে হিন্দুদের পূজা-পার্বন উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। আব্বাস ভাবলেন, মুসলমানদেরও অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান রয়েছে। এই সব দিন উপলক্ষে যদি অনুষ্ঠান করা যেতো। সামনে ফাতেহা দোয়াজ দহম। এই অনুষ্ঠানটা করা যায়। কথাটা পাড়লেন তিনি স্টেশন ডিরেক্টর নৃপেন মজুমদারের কাছে।

—কি ধরনের অনুষ্ঠান করতে চাও, পরিকল্পনাটা বলো।

— অনুষ্ঠানে হযরতের জন্ম বৃত্তান্ত, কোরেশদের অত্যাচারের কাহিনী, বিভিন্ন যুদ্ধের ঘটনা ইত্যাদি শুধু গানে গানে বর্ণনা করা হবে।

—মহা সর্বনাশ হবে তাতে। নবী-রাসুলের নাম নিয়ে রেডিওতে গান ? মুসলমানরা আর আস্ত রাখবে না আমাকে। তারা যে গোঁড়া। আমার রেডিও অফিসই উড়িয়ে দেবে।

—কিছুই হবে না। ইসলামী গানের রেকর্ড কি মুসলমানরা কেনে না ?

—ঠিক আছে, তুমি যদি মওলানা আকরম খাঁর নিকট হতে পান্ডুলিপিটার উপর ' আপত্তি নেই' লিখে আনতে পারো তাহলে প্রচার করতে পারবো।

আব্বাসউদ্দীন তখনই গেলেন মওলানা আকরম খাঁর 'আজাদ' অফিসে। দেখালেন তাকে পান্ডুলিপিটা। পড়ে তিনি তো মহা খুশি। আব্বাসকে উৎসাহ দিয়ে বললেন,–চমৎকার চিন্তাধারা তোমার। গানে গানে এইভাবে নিরস মুসলিম সমাজকে জাগাতে হবে। প্রচারের জন্য উচ্চসিত মন্তব্য তিনি লিখে দিলেন পান্ডুলিপিটার উপর।

আব্বাসউদ্দীনের একক প্রচেষ্টায় রেডিওতে ইসলামী অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হলো। তারপর একে একে শবে বরাত, শবে কদর, ফাতেহা ইয়াজ দহম, মহররম, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা হত্যাদি ধর্মীয় দিনেও রেডিওতে প্রচার হতে লাগলো অনুষ্ঠানমালা। শবে বরাতের দিন আব্বাসউদ্দীন বেশ করে রুটি আর হালুয়া এনে খাওয়ালেন রেডিও অফিসের কর্মীদের।

মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠানে উর্দ্দু গজল শোনানো হয়। বাঙালী শ্রোতারা তা বোঝে না। মনে করে আরবী ভাষায় রচিত। গদ গদ সুরে অর্থ না বুঝেই সুর করে গেয়ে যায় তারা।

www.pathagar.com

বিষয়টি আব্বাসের মনে লাগলো। কবি গোলাম মোস্তফাকে বললেন, উর্দুর পরিবর্তে বাংলাতে গজল লিখতে। মিলাদের মাঝে দাঁড়িয়ে যখন কেয়াম পড়ানো হয় তখন তিনি বাংলায় এই গজল পড়বেন।

তাই হলো। গোলাম মোস্তফা লিখলেন–

তুমি যে নূরের রবি
নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবি।

প্রচলিত সুরে আব্বাস তা কণ্ঠে উঠিয়ে নিলেন। মিলাদ শরীফে পরীক্ষা-মূলকভাবে ব্যবহার করতে লাগলেন এই কবিতাটি। অপূর্ব সমন্বয় হলো। উর্দু ভাষাকে তাড়িয়ে দিয়ে বাংলায় এই নবী স্তুতি স্থায়ী আসন নিতে পারলো।

রেডিও অফিসে একদিন আব্বাসউদ্দীন বসে আছেন গান গাইবার জন্য। ইতোমধ্যে রেডিওর কর্মীদের সাথে তার বেশ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে। একজন কর্মীকে তিনি বললেন,–হেমন্ত নামে একজনের রেকর্ড শুনলাম সেদিন। তার গলাটা ভারি চমৎকার মনে হলো। তোমরা শুনেছো রেকর্ডখানা ?

—শুনেছি। উত্তর দিলেন বন্ধুটি। তারপর বন্ধুটি বললেন,–হেমন্ত ছেলেটি আজ পাশের ঘরেই আছে। রেডিওতে আজ তার অডিশনের দিন।

—ডাকো ছেলেটিকে।

ডাক পেয়ে হেমন্ত এলেন আব্বাসউদ্দীনের কাছে। নামকরা শিল্পী আব্বাসের কাছে দাঁড়াতেই দ্বিধায় পড়লো সে।

আব্বাসউদ্দীন গভীর আন্তরিকতায় হাত ধরলেন তার। বললেন,– তোমাকে আমি একটা কথা বলবো। কিছু মনে করো না। সবাইকে উদ্দেশ্য করেই তিনি বললেন, তোমরা দেখে নিও এই ছেলেটি একদিন শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতে জনপ্রিয় গায়ক হবে।

কথাটি শোনামাত্র হেমন্ত আব্বাসউদ্দীনের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলো। বললো,–আশীর্বাদ করবেন। আমি যেন আপনার কথাটি সত্যে পরিণত করতে পারি। ইনিই পরবর্তীকালের হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

www.pathagar.com

ছয়

এই সময়ে রাজনীতিতে, সাহিত্যে সংগীতে খেলাধূলায় মুসলমানদের নব জাগরণ শুরু হয়েছে। এ,কে, ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নাজিমুদ্দীন রাজনৈতিক গগনের মধ্যমণি। নজরুল তো কবিতা আর গান লিখে বাংলাদেশের মুসলিম যুবকদের প্রাণে জোয়ার এনেছেন। আর আব্বাসউদ্দীন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সভা-সমিতিতে ইসলামী গান, সাধারণ মানুষের ভাটিয়ালী ভাওয়াইয়া গান শুনিয়ে উদ্দীপ্ত করে চলেছেন।

ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন। মুসলমানদের প্রাণে আশার সঞ্চার করলো। ফজলুল হকও বাংলার কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য একে একে নানা পদক্ষেপ নিতে লাগলেন। ঋণ শালিসী বোর্ড গঠন করা হলো। শিক্ষা বিস্তারের জন্যও তৈরি হতে লাগলো স্কুল কলেজ।

একদিন প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে ডাক এলো আব্বাসউদ্দীনের। গেলেন তিনি দেখা করতে। প্রধানমন্ত্রী তখন কথা বলছিলেন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে।

—প্রধানমন্ত্রী হলাম। কিন্তু তোমার দেখা নেই। সন্তুষ্ট হওনি ?

—খুব হয়েছি। বাংলার মুসলমানরা আসমান হাতে পেয়েছে।

—এখন কোথায় চাকরি করছো, তুমি ?

—কোনো চাকরি নেই আপাতত। বারো বছর ধরে কৃষি বিভাগে একটা চাকরি করেছি। এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার ব্যবহারে অতীষ্ট হয়ে তা ছেড়েছি।

—ভালোই হয়েছে। তোমার উপযুক্ত একটা কাজ আমরা দিবো। একটা দরখাস্ত রেখে যাও।

সত্যি মাস খানেকের মধ্যে আব্বাসের নামে নিয়োগপত্র গেলো। পদবী হলো, রেকর্ডিং এক্সপার্ট টু দি গর্ভমেন্ট অব বেঙ্গল।

আব্বাসউদ্দীন যোগদান করলেন কাজে। তার কাজ হলো মন্ত্রীদের বক্তৃতা, দেশপ্রেমমূলক গান ইত্যাদি রেকর্ড করা এবং তা গ্রামে গঞ্জে পাঠিয়ে দিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করা। এতোদিন পরে মনের মতো একটা কাজ পেলেন আব্বাসউদ্দীন।

বরিশাল জেলায় নিজ গ্রাম চাখারে শেরে বাংলা ফজলুল হক একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার উদ্বোধন হবে। হক সাহেব আব্বাসউদ্দীনকে দাওয়াত দিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গান গাইতে হবে।

হক সাহেব দলবল নিয়ে আগেই রওনা হলেন চাখারের পথে। আব্বাসউদ্দীন গেলেন পরে। হুলারহাট হতে লঞ্চ ধরতে হবে। লঞ্চে উঠতে

www.pathagar.com

যাবেন। এমন সময় দেখলেন, হক সাহেব সেই রাত চারটার সময় রয়ে গেছেন লঞ্চ স্টেশনে। আব্বাসকে ডেকে বললেন,–তোমার অপেক্ষাতে আছি। এতো দেরি করে এলে কেন ?

অবাক হবার পালা আব্বাসের। তার মতো সামান্য একজন চাকরিজীবীর জন্য অপেক্ষা করছেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী।

লঞ্চে উঠে হক সাহেবের আদেশে গরম পোলাও আর মাংস পরিবেশন করা হলো। হক সাহেবও খেতে বসলেন আব্বাসউদ্দীনের সাথে।

— এই অজ পাড়াগায়ে একটা কলেজ বানিয়ে আপনি মহা সর্বনাশ করছেন। স্মিত্যহাস্যে বললেন আব্বাসউদ্দীন।

— আমি এতো কষ্ট করে কলেজ বানালাম। আর তুমি বলছো সর্বনাশ করছি। অভিমানের কণ্ঠে বললেন হক সাহেব।

— সর্বনাশ হলো এই কারণে যে, মেট্রিক পাশ করে কোথায় তারা যাবে কোলকাতায়। দেখবে আকাশচুম্বি অট্টালিকা, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর। ঘুরবে ট্রেনে, বাসে, ট্যাক্সিতে। দেখবে সিনেমা থিয়েটার। তা নয়, সেই বৈঠা ঠেলে ঠেলে আবার আসবে কলেজে পড়তে।

এবার হো হো করে হেসে উঠলেন হক সাহেব। বললেন,–আব্বাস, তুমি শুধু এই দিকটা দেখলে। আরো দু'বছর যে ওরা মায়ের স্নেহের ছায়ায় থাকবে, গ্রামের খাঁটি ঘি-দুধ খাবে, উপরের নীল আকাশ দেখবে, নির্মল বায়ু সেবন করে ফুসফুসের শক্তি বাড়াবে তা কি তোমার মনে এলো না ?

শেরে বাংলার মুখে মায়ের স্নেহের ছায়ায় থাকার কথা শুনে আব্বাসউদ্দীন আনমনা হয়ে পড়লেন। আসার সময় শুনে এসেছেন মায়ের খুব অসুখ। মার জন্য সত্যি সত্যিই তার মন আনচান করে উঠলো। কুচবিহারের দেশের বাড়িতে যেতে ভারি ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু আপাতত যাওয়া যাচ্ছে না। পাবনার শাহজাদপুরে প্রাইমারী শিক্ষকদের একটা সম্মেলন ডাকা হয়েছে। আয়োজকরা কোলকাতায় এসে আব্বাসউদ্দীনকে দাওয়াত দিয়ে গেছেন। মন্ত্রী তমিজউদ্দীন ঐ সভায় সভাপতিত্ব করবেন। বক্তৃতা করবেন সৈয়দ আসাদ-উদ-দৌলা শিরাজী। গান গাইবেন আব্বাসউদ্দীন। তিনি তাদের কথা দিয়েছেন সভাতে হাজির হবেন। কথা দিয়ে তা রক্ষা করা আব্বাসউদ্দীনের চরিত্রের বড় গুণ। এই শিক্ষা তিনি পেয়েছেন পারিবারিকভাবে, তার পিতার নিকট হতে।

পাবনার শাহজাদপুরে এলেন আব্বাসউদ্দীন। প্রাইমারী শিক্ষকদের সম্মেলনে আব্বাসউদ্দীন গান গাইবেন শুনে হাজির হয়েছে বিশাল জনতা।

www.pathagar.com

মুসলিম প্রধান অঞ্চল। আরেক মুসলমান শিল্পীর গান শোনার জন্য, তাকে স্বচক্ষে দেখার জন্য ঘরে কেউ নেই।

নজরুলের ইসলামী গান আর এই অঞ্চলের ভাওয়াইয়া গান গেয়ে আব্বাস মাতিয়ে তুললেন আসর। শ্রোতাদের অনুরোধে একের পর এক গান গাইতে হলো। বেশ রাত হয়ে গেলো অনুষ্ঠান শেষ হতে।

মন্ত্রী প্রধান অতিথি বলে তার জন্য থাকার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আব্বাসউদ্দীন আর শিরাজীর খোঁজ কে নেয় ? তারা এসে উঠলেন একটা স্কুল ঘরে। চিড়ে মুড়ি খেয়ে পেট ভরলেন। চারটা বেঞ্চ একত্রিত করা হলো। এইভাবে রাত কাটাবার ব্যবস্থা হলো দুই জনের।

একটু পরে তারা দেখলেন, টর্চ নিয়ে এদিকে কারা যেন আসছে। চোর ডাকাত নয় তো। আব্বাস ভয় পেলেন। শিরাজী পাবনারই লোক। এগিয়ে গেলেন তিনি ব্যাপারটা দেখার জন্য।

—গায়ক সাহেবও কি এখানে আছেন ? শিরাজীকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো আগন্তুকরা।

—কি দরকার তাকে দিয়ে ? বিরক্ত হলেন শিরাজী।

— মন্ত্রী সাহেব ডাকছেন। আপনাকে আর গায়ক সাহেবকে না নিয়ে কিছুতেই খাবেন না তিনি। পোলাও কোর্মা সব ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—মন্ত্রী মহোদয়কে গিয়ে বলুন, আমরা খেয়ে ফেলেছি। মন্ত্রী যখন হতে পারবো পোলাও কোর্মা তখন দেখা যাবে। রাগ হয়েছে শিরাজীর।

আগন্তুকরা নাছোড়বান্দা। তারা বললো,-প্রাইমারী শিক্ষকরা আপনাদের সাথে ভালো আচরণ করেনি। কেটে পড়েছে তারা। গাটের পয়সা খরচ করে আপনাদের কোলকাতায় ফিরতে হবে। আমরা এই সম্মেলনের সাথে জড়িত নই। মন্ত্রী বাহাদুরের এক কথা। আপনাদের না নিয়ে খাবার স্পর্শ করবেন না তিনি।

বাধ্য হয়ে যেতে হলো তাদের। মন্ত্রী সত্যিই বসে ছিলেন হাত উঠিয়ে। শিক্ষকদের হয়ে ক্ষমা চাইলেন তিনি।

পাবনা থেকে সোজা চলে এলেন তিনি কুচবিহারে। সত্যিই তার মায়ের বড় অসুখ। স্নেহময়ী মা মৃত্যুশয্যায়। কতো কথা, কতো স্মৃতি এসে ভীড় জমাতে লাগলো আব্বাসের মনে। আব্বাসকে দেখে মায়ের মুখ উজ্জ্বল হলো। স্নেহের হাতে পরশ বুলালেন আব্বাসের চোখে মুখে।

চারদিনের মাথায় আব্বাস তার মাকে হারালেন। মনে হলো, আল্লাহ বুঝি শেষ দেখার জন্য মাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। মায়ের মৃত্যুতে শোকের ছায়া

www.pathagar.com

নেমে এলো সারা গ্রামে। একজন পরোপকারী মানুষ, একজন দানশীল রমনী বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে। আব্বাসও হারালেন অকৃত্রিম স্নেহ পাওয়ার শেষ অবলম্বনটুকু।

আবার মহানগরী কোলকাতাতে ফিরে এলেন আব্বাসউদ্দীন। এবার ডাক এলো তার মুর্শিদাবাদ থেকে। সানন্দে রাজী হলেন আব্বাসউদ্দীন। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্মৃতি বিজড়িত স্থান দেখার সাধ তার বহুদিনের।

মুর্শিদাবাদে এলেন। মাতিয়ে দিলেন গানে গানে। মুসলিম প্রধান এলাকা বলে সমাদর পেলেন খুবই। নবাবকে যেখানে হত্যা করা হয়েছে গেলেন সেখানে। নবাবের শিশু কন্যা সন্তানটির জন্য মন তার ব্যথাতুর হয়ে পড়লো। নবাবকে নিয়ে গান লেখা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তা করলেন।

গ্রামোফোন কোম্পানীর ম্যানেজার হেমচন্দ্র সোম বাবুর সাথে কথা বললেন। সিরাজের স্মৃতি নিয়ে একটা রেকর্ড বের করার প্রস্তাব দিলেন তার কাছে।

—উত্তম প্রস্তাব। তুমি গান যোগাড় কর। রেকর্ড করাবার ব্যবস্থা আমার।

ইংরেজ শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভারতবাসীরা তখন মরণপণ সংগ্রামে রত। শৈলেন রায় গনজাগরণমূলক গান লিখছেন। আব্বাসউদ্দীন গেলেন তার কাছে। দু'খানা গানও লিখে দিলেন শৈলেন রায়। সুর সৃষ্টির জন্য হিমাংশু দত্তের কাছ যেতে বললেন তাকে।

হিমাংশু দত্তের সাথে আব্বাসের আগেই পরিচয় আছে। গভীর বন্ধুত্ব দু'জনের। গান দু'খানায় অপূর্ব সুর দিলেন তিনি। আব্বাস দিলেন কণ্ঠ। অল্প দিনের মধ্যে রেকর্ড হয়ে গেলো তা।

রেকর্ড তো হলো। কিন্তু রেকর্ডটি বাজারে ছাড়তে দ্বিধা করতে লাগলেন সোম বাবু। ইংরেজ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার কথা আছে এই গানে। ক্ষমতার মসনদে তারাই আসীন। এই গান বাজারে গেলে পুলিশ অত্যাচার করবে কিনা এই তার ভয়।

আশঙ্কার কথাটি শুনে আব্বাসউদ্দীন বললেন,–আমি যদি বাংলার প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে 'আপত্তি নেই' ছাড়পত্র এনে দিই তা হলে কি বাজারে ছাড়া যাবে ?

—অবশ্যই যাবে। সে ব্যবস্থা কি করতে পারবে তুমি ?

আব্বাস আর দেরি করলেন না। গান দু'টিতে হিমাংশু দত্ত দিয়েছেন অপূর্ব সুর। আব্বাস দিয়েছেন মন উজাড় করে কণ্ঠ। সৃষ্টির আনন্দে তিনি তখনই গেলেন হক সাহেবের কাছে। তাকে শোনালেন গান দু'খানা। সিরাজ আর পলাসীর স্মৃতি নিয়ে লেখা গান শুনে প্রধানমন্ত্রী আবেগে আপ্লুত হলেন। চোখে

www.pathagar.com

পানি এলো তার। আবেগের বশেই বলে ফেললেন,–এই রেকর্ড লক্ষ ভারত-বাসীর কাছে পৌছে দাও।

— সেখানেই তো সমস্যা। রেকর্ড কোম্পানী ভয় পাচ্ছে এটা বাজারে ছাড়তে।

— সিরাজকে হত্যা করেও ওদের কি ঝাল মেটেনি ? তার জন্য দু'দন্ড শোক প্রকাশ করতে দেবে না ? কোথায় সেই মীর জাফর সেই মোহাম্মদী বেগ-- রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়লেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী।

— মীর জাফরদের খুঁজে কাজ নেই। আপনি শুধু এই কাগজখানাতে 'আপত্তি নেই' কথাটি লিখে দিন। তাতেই কাজ হবে।

হক সাহেব তখনই তার উপর আপত্তি নেই কথাটি লিখে দিলেন। খুশি মনে আব্বাস সেটা দিলেন গ্রামোফোন কোম্পানীকে। বাজারে রেকর্ড ছাড়তে আর দেরি করলো না কোম্পানী।

এই সময়ে বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক আকাশে দেখা দিলো অশনি সংকেত। মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা স্যার সেকেন্দার হায়াত খান পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী। পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় শহীদগঞ্জের মসজিদটিকে তাদের ধর্মীয় উপাসনালয় 'গুরুদ্বার' বলে দাবী করলো। মুসলমানরাও ঐক্যবদ্ধ হলেন এর বিরুদ্ধে। মামলা গড়ালো হাইকোর্ট পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিলের রায় শিখদের পক্ষে গেলো।

ভারতের মুসলমানরা গর্জে উঠলো এর প্রতিবাদে। আল্লামা মাশরেকীর নেতৃত্বে যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানরা একত্রিত হলেন। বাংলাও কম যায় না। তারা জীবন দেবেন কিন্তু শিখদের হাতে মসজিদ দিবেন না।

অবস্থা বেগতিক দেখে সেকেন্দার সরকার মসজিদ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করলেন। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা তা উপেক্ষা করলো। ঘিরে রইলো তারা মসজিদটি। শেষ পর্যন্ত সেনা বাহিনীর গুলীতে প্রাণ দিলেন কয়েকজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান।

পাঞ্জাবের এই ঘটনা বাংলাতেও তুমুল আলোড়ন তুললো। এই দেশের মুসলমানরা চিন্তা করতে শুরু করলেন, মুসলিম লীগ বড় না ইসলাম বড়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আগে থেকেই মুসলিম লীগ ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে লেগে আছে। তাদের সংবাদপত্রগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা বানোয়াট খবর ছাপিয়ে যাচ্ছে। পাঞ্জাবের এই ঘটনা নিয়ে নানা কাল্পনিক কাহিনী

www.pathagar.com

প্রকাশ করতে লাগলো তারা। মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উসকিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা।

জাতির এই অশুভ মুহূর্তে ভৈরবে এক বড় রাজনৈতিক জনসভার আয়োজন করা হলো। হ্যান্ডবিলে ভারতের মুসলিম নেতাদের নাম ছাপা হয়েছে। এ কে ফজলুল হক, খাজা নাজিমউদ্দীন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আব্বাসউদ্দীনের নামও আছে এই তালিকায়।

সভার কাজ শুরু হলো। অসুস্থতাজনিত কারণে শেরে বাংলা আসতে পারেননি। সভাপতির দায়িত্ব নিলেন খাজা নাজিমউদ্দীন।

সভাপতির নির্দেশে খুলনার দরগাহপুরের কারী মাহমুদ আলী কোরআন তেলোয়াৎ করলেন। তারপর উদ্বোধনী সংগীত গাইলেন আব্বাসউদ্দীন। এবার বক্তৃতা দিতে উঠলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

সোহরাওয়ার্দী ভালো বাংলা বলতে পারেন না। তাই তার বক্তৃতা তিনি এনেছেন লিখিত আকারে। তার লম্বা ইংরেজিতে লিখিত বক্তৃতা শোনার ধৈর্য নেই শ্রোতাদের। 'হক সাহেব কই' বলে সভায় বেশ হট্টগোল শুরু হলো। বিশাল জনতা বাংলার প্রাণপ্রিয় নেতা হক সাহেবকে দেখতে চায়। অবস্থা ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে যেতে লাগলো।

অবস্থা বেগতিক দেখে সোহরাওয়ার্দী সাহেব আব্বাসউদ্দীনের কানে কানে বললেন,–তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না এই অশান্ত জনতাকে শান্ত করতে। গান ধরো এবারে।

—এতো গানের জলসা নয়। আগে সভার শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন।

—ঐটাই তোমার কাজ। বক্তৃতা দিয়ে শৃঙ্খলা ফেরানো যাবে না। তুমি গান ধরলে জনতা আয়ত্তে আসতে পারে।

তাই হলো। আব্বাসউদ্দীন গান ধরলেন 'ওঠরে চাষী জগৎবাসী ধর কষে লাঙ্গল'। জাদুর মতো কাজ হলো। সভা নিস্তব্ধ হতে লাগলো। নেতারা আর বক্তৃতা করতে সাহস পেলেন না। জনসভা রূপান্তরিত হলো গানের আসরে। পর পর কয়েকটা গান গাইতে হলো আব্বাসউদ্দীনকে।

রংপুরের ছাত্ররা একটা রাজনৈতিক সভার আয়োজন করেছে। সভা শেষে গান হবে। প্রধান বক্তা রংপুরের ছাত্র নেতা ওয়াছেক। রংপুরের প্রতি আব্বাসউদ্দীনের দুর্বলতা আছে। ছাত্রজীবনে এক রাতে তিনি এখানে ছিলেন। মশাকূল খুব বেশি উৎপাত না করলে হয়তো রংপুর কলেজে বি, এ, ভর্তি হতেন। তাই দাওয়াত কবুল করলেন সহজে। অনুষ্ঠানে আরো গান গাইবেন

www.pathagar.com

কোলকাতার গিরীন চক্রবর্তী, আবদুল করিম বালী আর তবলা সহযোগিতা করবেন বজলুল করিম।

অনুষ্ঠানের দিনে রংপুর এলেন আব্বাস। কোথায় জনসভা ? স্থানীয় টাউন হলে সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। টিকিটের ব্যবস্থা করে মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়েছে উদ্যোক্তরা। টাউন হলের মধ্যে যতো লোক তার চেয়ে বেশি লোক বাইরে। টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছে তারাও। হলের মধ্যে তিল ধারণের জায়গা নেই। কোলকাতার গায়কদের গান শুনতে চায় তারা। এতো লোকের আয়োজন দেখে ভয়ে পালিয়েছে আয়োজকরা।

এক লহমায় আব্বাস বুঝে নিলেন ব্যাপারটা। একটু পরেই এখানে শুরু হবে মারামারি। গাটের পয়সা খরচ করে কেউ কি ফিরে যাবে খালি হাতে ? চেয়ার, মাইক এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ভাগাভাগি করে নিয়ে যাবে তারা বাড়িতে।

কুচবিহার আর রংপুরের পরিবেশগত অবস্থা একই ধরনের। আব্বাস বুঝতে পারলেন আয়োজকরা জনগনকে ফাঁকি দিয়েছে, তাদের তো দিয়েছেই। কিন্তু আব্বাসের নাড়ির বন্ধন জনতার সাথে। তিনি তো আর ফাঁকি দিতে পারেন না।

সাহস করে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন আব্বাসউদ্দীন। মাইক চালু করা হলো। আব্বাস বললেন,–আমরা কোলকাতা থেকে এসেছি। জানি না কারা এই জলসার আয়োজন করেছে। আপনারা কি গান শুনতে চান ?

—গান শুনতেই তো এসেছি। গাটের পয়সা কি আর খালি খালি খরচ করেছি ? জনতার মধ্য থেকে উত্তর দিল কয়েকজন।

—তা হলে আপনাদের একটু কষ্ট করতে হবে। হল ঘরের বাইরে যারা আছেন তারাও গাটের পয়সা খরচ করেছেন। গান তারাও শুনতে চান। সবার উদ্দেশ্য গান শোনা। একটা প্রস্তাব রাখতে চাই আমি।

—যে প্রস্তাবই রাখুন, গান না শুনিয়ে যেতে পারবেন না।

— গান শোনার জন্যই প্রস্তাবটা। বাইরের মাঠে উন্মুক্ত মঞ্চে গান গাইবো আমরা। তাতে ঘরে এবং বাইরের সবাইকে গান শোনাতে পারবো। আজ আপনারা আমাদের গান শুনবেন, টিকেটের পয়সা ফেরত নিবেন আমরা যাওয়ার পরে।

হলের মধ্যের দর্শকরা সহজেই রাজী হয়ে গেলো। আরাম কেদারা ছেড়ে বাইরের সবুজ ঘাসের উপর আসন নিল তারা।

জ্যোৎস্না প্লাবিত মাঠ। দর্শকের কমতি নেই। গিরীন চক্রবর্তী পর পর কয়েকটা গান গেয়ে জনতাকে মাতিয়ে তুললেন। আবদুল করিম গাইলেন ঠুংরী।

www.pathagar.com

জমাতে পারলেন না তেমন। কিন্তু গজল ধরে মাতিয়ে তুললেন শ্রোতাকে। এবারে আব্বাসউদ্দীনের পালা। এই এলাকার জনগণের মন-মানসিকতা তার ভালোই জানা আছে। তিনি ধরলেন ভাওয়াইয়া আর ভাটিয়ালী। হাজার জনতা তার কণ্ঠে সুর তুললো। মঞ্চের একজন আব্বাসউদ্দীন রূপান্তরিত হলেন মাঠের হাজারো আব্বাসউদ্দীনে।

রংপুরের রসুলপুরের জনতা নিমন্ত্রণ করলো আব্বাসউদ্দীনকে। তিনি গান গাইবেন। বক্তৃতা করবেন সৈয়দ আসাদ-উদ-দৌলা শিরাজী। এই এলাকায় মুসলমানদের জাগানোর দায়িত্ব পেয়েছেন তারা। মুসলিম লীগ যে পাকিস্তানের দাবী পেশ করেছে তার স্বপক্ষে প্রচারণার জন্যই এই জনসভার আয়োজন।

রংপুর শহর থেকে একটা বাস যোগাড় করা হলো। বিশ জনের মতো লোক গাদাগাদি করে বসলেন তার মধ্যে। বাস চলছে একটা নদীর পাশ দিয়ে। কিছুদূর চলার পর আব্বাস বুঝলেন, কোথাও একটা সমস্যা আছে। বাসটিকে যেন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেন না তার চালক। আব্বাস আর শিরাজী আমন্ত্রিত ব্যক্তি। তাই চালকের পাশেই বসার ব্যবস্থা হয়েছে তাদের। হর্ণ বাজিয়ে বাস চলছে। রাস্তার দুপাশে বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে তাদের দেখার জন্য। কিন্তু নানা কসরত করেও চালক কিছুতেই বাসের গতি কমাতে পারছে না।

বিপদের গুরুত্ব আব্বাস বুঝলেন। স্মরণ করতে লাগলেন আল্লাহকে। চালক বুদ্ধি করে গাড়ির স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিল নদীর দিকে। নদীর তীরে বালুর উপর গেলে হয়তো বা থামানো যাবে গাড়ির চাকা।

তা আর হলো না। চোখের পলকেই বাসটা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো নদীর অথৈ পানিতে। আব্বাসের মনে হলো, বাসটা যেন চেপে বসেছে তার পিঠের উপর। জ্ঞান হারালেন তিনি।

জ্ঞান যখন ফিরলো দেখলেন অজস্র জনতার ভিড়। সবার মুখে হায় হায় রব। আহতদের করুণ চিৎকার। আব্বাসের কপালের কিছু অংশ কেটে গেছে। দর দর করে রক্ত ঝরছে সেখান থেকে। একটা গামছা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হলো ক্ষত স্থানটা। রক্ত পড়া বন্ধ হলো কিন্তু বুকে অসহ্য যন্ত্রণায় দম নিতে পারছেন না তিনি। এখান থেকে হাসপাতাল অনেক দূরে। যাওয়ারও কোনো ব্যবস্থা নেই। শোনা গেল, রংপুর শহর হতে মোটর আনার জন্য লোক পাঠানো হয়েছে।

মোটর এলো বেশ রাতে। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই কারো। আব্বাসের অবস্থা আরো করুণ। আল্লাহ এ যাত্রা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। কৃতজ্ঞতার দু'চোখ ভরে পানি এলো তার। মা তাকে যে দোওয়া করেন, ফেরেশতা তোমাকে পাহারা দিবে–আজ সেই দোওয়াই কাজে লেগেছে।

www.pathagar.com

কোলকাতায় ফিরে এলেন আব্বাসউদ্দীন। সুস্থ হয়ে উঠতে সময় লাগলো বেশ কিছুটা। আগেই শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সে এক মহা দুর্যোগ।

১৯৩৯ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর। বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিয়ে জার্মানীর চ্যান্সেলর হিটলার পোলান্ড আক্রমণ করেছেন। সাজ সাজ রব পড়ে গেলো বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে। পোলান্ডের পতন হলো। দুর্বার হয়ে উঠলো জার্মান বাহিনী। ব্রিটেন, ফ্রান্স আর আমেরিকা দাঁড়ালো জার্মানীর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে জার্মানীর সাথে হাত মেলালো ইতালী, জাপান। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লো প্যারিসে। লন্ডনের আকাশেও হামলা চালালো ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রু বিমান।

ব্রিটিশ আর আমেরিকা এখন এক কাতারে। এশিয়ার দেশ জাপান। ভারতের জন্য সেটা হুমকি স্বরূপ। ভারতবর্ষে নেমে পড়লো আমেরিকান সৈন্য। জাপান-জার্মান ঠেকাতে হবে। কোলকাতায় চলতে লাগলো নিষ্প্রদীপের মহড়া। ট্রেঞ্চ খোঁড়া হলো, ব্যাফালো ওয়াল নির্মাণের কাজ চললো। এ আর পি রা শিক্ষা দিতে লাগলো কিভাবে বিমান আক্রমণের সময় ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিতে হয়। কোলকাতা শত্রুর লক্ষ্যস্থল। বোমা পড়ে পড়ে এই অবস্থা। মাঝে মাঝে প্রস্তুতিমূলক সাইরেন বাজে। মনে হয় রোজ কিয়ামতের সিঙ্গাধ্বনি।

এতোসব কান্ড দেখে ঘাবড়ে গেলেন আব্বাসউদ্দীন। পৈত্রিক প্রাণটা বুঝি এবার যায়। দলে দলে লোক পালাচ্ছে গ্রামে। হাওড়া আর শিয়ালদা স্টেশন লোকে লোকারণ্য। বাঙ্গালী নেতা সুবাস বসু নিজের বাড়িতে অন্তরীণ ছিলেন। হঠাৎ একদিন গায়েব হয়ে গেলেন তিনি। পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে কিভাবে যে তিনি পালালেন–এটাই কোলকাতায় আলোচনার বিষয়বস্তু। কিছুদিন পরেই সুবাস বসুকে দেখা গেলো জাপানে। আজাদ হিন্দু ফৌজ এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। শোনা গেলো, শীঘ্র তিনি জাপানী বোমারু বিমানের ঝাঁক নিয়ে কোলকাতায় নামবেন। আরো ভীত হয়ে পড়লো কোলকাতার বাসিন্দারা। পার্শ্ববর্তী দেশ বার্মায় বোমা পড়াতে আতঙ্ক বেড়ে গেলো আরো বেশি করে।

অফিস থেকে পনেরো দিনের ছুটি নিলেন আব্বাসউদ্দীন। বহু কষ্টে চলে এলেন বলরামপুরে। যুদ্ধের এই ডামাডোলের খবর গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। গ্রামে ফিরে আসায় সবাই তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ছুটির পনেরো দিন শেষ হলো। কিন্তু ফিরে গেলেন না আব্বাস কোলকাতায়। ডাকযোগে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন অফিসে। এইভাবে চললো তিন মাস। তারপর অবস্থা একটু শান্ত হয়ে এলে আব্বাস ফিরে এলেন কোলকাতায়।

www.pathagar.com

অফিসের বড় কর্তার নাম আবু হেনা। তার সাথে দেখা করতেই কথা শুনতে হলো। বললেন,–এই বাজারে চাকরি রক্ষা করা কঠিন কাজ। আপনার জন্য আমার কথা শুনতে হয়েছে মন্ত্রী প্রবরের। তবে এই যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেও আপনার জন্য একটা সুখবর জমা আছে।

—মেসে যা রেখে গিয়েছিলাম লুটপাট হয়েছে সেগুলো। সেগুলো কি কেউ জমা রেখে গেছে আপনার কাছে ?

—তা নয়। সরকার সং পাবলিসিটি অর্গানাইজেশন নামে একটা ডিপার্টমেন্ট খুলেছে। সেখানে গেজেটেড পোস্টে একজন অর্গানাইজার ও একজন অতিরিক্ত অর্গানাইজার নেওয়া হবে। কাজটা কিছুটা আমাদের হাতে। আমি ঠিক করে রেখেছি কাজী নজরুল ইসলাম আর আপনাকে পোস্ট দুটো দেয়া হবে। আপনি আজই খবর দিন কাজী নজরুলকে।

আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া আদায় করলেন আব্বাস। কৃষি বিভাগের সেই বড় কর্তার ছবিটা তার সামনে ভেসে উঠলো। ইস্তফাপত্র দেয়ার সময় তার মনে গোপন আশা ছিল, খোদা যেন তাকে কোনো গেজেটেড পোস্টে চাকরি মিলিয়ে দেন।

আব্বাস ছুটলেন নজরুলের বাসায়। যেয়ে শুনলেন 'নবযুগ' পত্রিকা অফিসে কাজ করার সময় নজরুল অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন কিছুদিন আগে। সেই থেকে তিনি কিছুটা অসুস্থ। সবকিছু ঠিকমতো মনে করতে পারছেন না।

কবি এলেন আব্বাসের সামনে। এ কোন কবি ? তাকে দেখে আগের মতো সেই উচ্চসিত হয়ে উঠলেন না। রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন বারে বারে। কবির পুত্র সানি তাকে ধরিয়ে বসিয়ে দিলো সামনের চেয়ারে।

অবস্থার যে এতোটা অবনতি হয়েছে আগে জানা ছিল না। আব্বাসের মনে হতে লাগলো শুধু অর্থনৈতিক কারণেই কবির এই বিপর্যয়। বিরাট সংসার। স্থায়ী আয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই।

—কাজীদা, নবযুগ পত্রিকায় চাকরি করেন টাকার জন্য। আমরা যদি পাঁচশো টাকার একটা চাকরি যোগাড় করে দেই, করবেন ?

—করবো। সংক্ষিপ্ত উত্তর নজরুলের।

কবিপুত্র সানি বললো,–আব্বার কিছুটা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। ডাক্তারও দেখানো হয়েছে। এখন তিনি বেশি কথাবার্তা বলেন না। সরকারের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন নিবেদন করা হয়েছে। কিন্তু আশানুরূপ কোনো সাড়া নেই। এই সময়ে যদি চাকরিটা হয়, সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি। বেঁচে যাবে সংসারটাও।

www.pathagar.com

— সেই চেষ্টাতেই এসেছি। আগামীকাল বেলা এগারোটার দিকে কাজীদাকে তৈরি করে রাখবে। আমি নিয়ে যাব। কথা যা বলার আমিই বলবো। অফিসে কাজ কিছুই না। মাসে দু'একটা গান লেখা। আমি কাজ করবো কবির সহকারী হিসেবে।

পরদিন নজরুলকে সাথে নিয়ে আব্বাসউদ্দীন গেলেন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। বড়কর্তা আবু হেনা সাহেব নজরুলকে পেয়ে যথেষ্ট সমাদর করলেন। তাজিমের সাথে বসতে দিলেন বাংলার বিদ্রোহী কবিকে। মোটামুটি ঠিক হয়ে গেলো কবিকে নেয়া হবে অর্গানাইজার পদে।

ভাগ্য বলে বুঝি একটা কথা আছে। সবকিছু ঠিকঠাক। বাগড়া দিলেন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়। পুলিন বিহারী মল্লিক বিভাগের মন্ত্রী। গোপনে দুইজন 'মোল্লা' ঢুকবেন বড় পদে। তা কি হতে দেয়া যায় ? তার আত্মীয়ের কি অভাব পড়েছে ? কিভাবে যেন তার কানে গিয়েছে নজরুলের অসুস্থতার খবর। এই সুযোগই নিলেন তিনি। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলো তার উদ্যোগে। তিনিই ইন্টারভিউ নিবেন। আব্বাসও দরখাস্ত করলেন। পাওয়া চাকরি হারালেন নজরুল। তার জায়গায় মন্ত্রীর প্রার্থী সুরেশ বাবু নিয়োগ পেলেন। দ্বিতীয় হলেন জসিমউদ্দীন। আর তৃতীয় নমিনেশন আব্বাসউদ্দীনকে।

রাজনৈতিক পরিমন্ডলেও পট পরিবর্তন হলো। ফজলুল হক উদারপন্থী রাজনীতিবিদ। তার মন্ত্রীসভার মন্ত্রী শ্যামা প্রসাদ, শরৎ বোস প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগলো। তারা বেঁচে থাকতে বরিশালের 'কদুর ব্যাপারীরা' কিনা করবে বাদশাহী ? তা বরদাস্ত হলো না তাদের। তাদের ষড়যন্ত্রের মুখে পতন হলো হক মন্ত্রী সভার।

শ্যামা-হক্ব মন্ত্রীসভার পতন নিয়ে নানা কথা শোনা গেলো। কেউ কেউ বললেন, বড় লাট হাবার্ট সাহেব হক সাহেবকে ডেকে নিয়ে জোর করে ইস্তফা পত্র লিখে নিয়েছেন। হক সাহেব বললেন,–সরকার 'বঞ্চনা নীতি' নামে এক মারাত্মক আইন জারী করতে চায়। আমি তা সমর্থন করতে পারছি না বলে ইস্তফা পত্র দিতে হলো।

হক সাহেবের পতনে আব্বাসউদ্দীন ব্যথিত হলেন। সরকারী চাকরিজীবী হিসেবে নয়, একজন মুসলমান হিসেবে। তার কেবলই মনে হতে লাগলো, হক সাহেব ডঃ শ্যামা প্রসাদকে এতো বেশি ক্ষমতা না দিলেও পারতেন।

www.pathagar.com

৩রা এপ্রিল ১৯৪৩ সাল। খাজা নাজিমউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। তার মন্ত্রীসভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলেন বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী।

সারা ইউরোপে তখনো চলছে যুদ্ধের বিভীষিকা। ফ্রান্সের দুর্ধর্ষ জেনারেল পেঁতা রক্ষা করতে পারলেন না তার দেশকে। এদিকে ভারতবর্ষের অবস্থাও শোচনীয়। দেশে খাদ্য সরবরাহ নেই। আমেরিকান সৈন্যদের পিছনে ব্যয় হচ্ছে সরকারী রসদ। লোকজনের হাতে কাজ নেই। শোনা গেল, দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। খাদ্যের অভাবে মানুষ হন্নে হয়ে উঠলো। গ্রাম ছেড়ে সবাই জড়ো হলো কোলকাতায়। 'ফেন দাও ফেন দাও' বলে রাতে কঙ্কালসার নর-নারীর চিৎকার। পুলিশের তৎপরতা বাড়লো। গাড়ী ভর্তি করে তারা কঙ্কালসার লোকজনকে শহর থেকে চালান করে দিল বাইরে। দুর্ভিক্ষের এই ছবি দেখে শিল্পী আব্বাসের দরদী মন উতালা হয়ে ওঠে। একবেলা খেয়ে আরেক বেলার ভাত বিলিয়ে দেন পথের কাঙ্গালীকে। এই দুর্ভিক্ষ পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত।

খাজা নাজিমউদ্দীনের মন্ত্রীসভাও বেশিদিন কাজ করতে পারলো না। তারা দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করতে পারেনি। সৈয়দ নওশের আলী স্পীকার। ডেপুটি স্পীকার জালালুদ্দীন হাসেমী। সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দীন কৃষি মন্ত্রী। আইন পরিষদে তিনি বাজেট বিল উত্থাপন করলেন। বিল নিয়ে ভারি তর্ক-বিতর্ক হলো পার্লামেন্টে। বিরোধী দল থেকে দাবী করা হলো ভোটাভুটির। স্পীকার বিলটি ভোটে দিলেন। ভোটে হেরে গেলো সরকারী দল। বিরোধী দল খুশি হলেও ক্ষমতায় তারা যেতে পারলো না। গণতন্ত্র বন্দী হলো। আমলাতন্ত্রের জগদ্দল পাথর চেপে গেলো নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবাসীর মাথায়।

মুসলিম লীগের এই দল-উপদলের রাজনীতি ব্যথিত করলো আব্বাসকে। বুকের উপর হাজার মনের পাথর চেপে রয়েছে বলে মনে হয় তার। দুঃখ ভোলার জন্য বিভিন্ন সভা সমিতিতে গান পরিবেশন করে বেড়ান। এমনি একটা জলসায় এলেন রানাঘাটে। হলঘর পরিপূর্ণ দর্শক। অল্প বয়সী একজন তরুণ গান গাইতে উঠলেন। যেমন মিষ্টি চেহারা তেমন মিষ্টি গলা। মুসলমান এই শিল্পীর নাম সোহরাব হোসেন। আব্বাস তাকে দেখা করতে বললেন রেলওয়ে রেস্ট হাউসে। সেখানে রাতে থাকবেন তিনি।

সোহরাব হোসেন এলেন দেখা করতে। আব্বাস তাকে বললেন,-তোমার গলা সূক্ষ্ম কাজে ভর্তি। তুমি কোলকাতায় যাও না কেন ?

—কোলকাতা বড় জায়গা। সেখানে ঠাঁই করে নেয়া আরো বড় ব্যাপার। কে আমাকে সাহায্য করবে ?

www.pathagar.com

—আমিই করবো। তোমার মাঝে লুকিয়ে আছে শিল্পী জীবনের অমীত সম্ভাবনা। তুমি দেখা করবে আমার সাথে।

সোহরাব হোসেন এলেন কোলকাতাতে। মল্লিক সাহেবের সেই 'জাতের টান' আব্বাসের উপরও ভর করলো। তিনি সং পাবলিসিটিতে সোহরাব হোসেনের চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন। বলে দিলেন,–দেখ সোহরাব, কোলকাতায় নতুন এসেছো। গায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে দুইটা জিনিস ত্যাগ করতে হবে তোমাকে সারা জীবনের জন্য।

—জিনিস দুইটা কি ?

—একটা হলো অহংকার আর অন্যটা পানীয়। এই লাইনে এই দুইটা জিনিসের দেখা পাবে হর হামেশা। কিন্তু লোভ সংবরণ করতে হবে তোমাকে। তা হলেই পারবে গান গেয়ে মানুষের অন্তরে ঠাঁই করে নিতে।

একজন সত্যিকারের অভিভাবকের সন্ধান পেলেন সোহরাব হোসেন।

www.pathagar.com

সাত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে আবার সারা বাংলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে দুর্ভিক্ষের ঝড়। মানুষ অকাতরে মরেছে অন্নের অভাবে। তারপর যুদ্ধের বিভীষিকা তাদের আরো করে ফেলেছে পর্যুদস্ত। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় স্বাধীনতার জন্য সোচ্চার হলো। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে ফজলুল হক মুসলমানদের জন্য আলাদা বাসভূমির দাবী জানিয়ে এসেছেন। ১৯৪৬ সালে হলো সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়লাভ করলো এবং স্বাধীনতার দাবীও জোরদার হতে থাকলো। বৃটিশ ভেবে রেখেছিল, স্বাধীনতা যদি দিতেই হয় কংগ্রেসের হাতে দিতে হবে। কিন্তু মুসলিম লীগও স্বাধীনতার দাবীদার। আর নয়, তারা একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র চায়।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী হলেন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী। দিনটি ২২শে এপ্রিল ১৯৪৬ সাল। অবিভক্ত বাংলায় ১১৯টি মুসলিম আসনের ১১৫টি তে মুসলিম লীগ বিজয়ী হয়েছে। সেই সুযোগে সোহরাওয়ার্দ্দী মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন। অর্থ মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। নূরুল আমীন হলেন বংগীয় প্রাদেশিক পরিষদের স্পীকার। মুসলিম লীগের অভান্তরে আরেকটি উপদলের নেতৃত্বে রয়েছেন নাজিমউদ্দীন, আকরাম খাঁ, মোহন মিয়া, শাহ আজীজ প্রমুখ।

নতুন প্রধানমন্ত্রী। সরকারী প্রচার বিভাগের কাজও বেড়ে গেলো বহুগুণে। প্রধানমন্ত্রী মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। ডাক পড়লো আব্বাস উদ্দীনেরও।

এমনি এক জনসভায় হাজির হয়েছেন আব্বাসউদ্দীন প্রধানমন্ত্রীর সাথে। সভাটি চুয়াডাঙ্গাতে। ডাঃ মালিকের বাসায় দুপুরে বড় ধরনের খাবার দাবারের আয়োজন। জুম্মার আজান পড়েছে। আব্বাস আর দেরি না করে গেলেন মসজিদে নামাজ আদায় করতে।

নামাজ পড়ে ফিরে আসার পরে শুনতে পেলেন প্রধানমন্ত্রী তাকে খুঁজছেন। দেখা করলেন তার সাথে। তিনি তখন খাওয়া দাওয়া সেরে রোদে বসে রোদ পোহাচ্ছিলেন।

— কি খবর আব্বাসউদ্দীন ? সরকারী কাজে এসে কোথায় ছিলে এতোক্ষণ ? খাবার টেবিলে তোমাকে খুঁজে হয়রান।

www.pathagar.com

—ধন্যবাদ আমার খোঁজ নেওয়ার জন্য। তবে আমি কিন্তু এতোক্ষণ আপনাকে মসজিদে খুঁজেছি। পাইনি সেখানে।

নামাজ না পড়ার বিষয়ে আব্বাসের খোঁচাটা প্রধানমন্ত্রী উপভোগ করলেন। স্মিতহাস্যে বললেন,–এই নিয়ে কত বার তুমি আমাকে প্রকাশ্যে জব্দ করলে আমি তার নোট রাখছি।

এর মধ্যে রাজনৈতিক গগণও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ সরকার তিন জন মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন ভারতবর্ষে একটা রাজনৈতিক সমাধানের পথ বের করার জন্য। মন্ত্রীরা হলেন লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও মিঃ আলেকজান্ডার। 'মন্ত্রী মিশন' তাদের কাজ শুরু করলেন। কংগ্রেস প্রস্তাব করলো, সমগ্র ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য নিয়ে একটি মাত্র ইউনিয়ন গঠনের। মন্ত্রী মিশন নীতিগতভাবে এই প্রস্তাবে সম্মতি জানালো। তারা এটাই তো চেয়ে আসছে। কিন্তু মুসলিম লীগ রইলো তাদের দাবীতে অনড়। কোনো ইউনিয়ন নয়। পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে মুসলিম প্রধান এলাকা নিয়ে গড়তে হবে পাকিস্তান। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলো মন্ত্রী মিশন। ফিরে গেলো তারা দেশে।

কংগ্রেসের এই অযৌক্তিক দাবীর বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য কুমিল্লার দেবীদ্বার থানায় এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। সোহরাওয়ার্দ্দী সাহেব তার সভাপতি। আব্বাসউদ্দীনকেও যেতে হবে সেখানে। কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থানে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন তিনি নিজেও। এই সব জনসভায় হাজির হয়ে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করার সুযোগ ছাড়বেন কেন ?

উঠলেন সরকারী বাংলোয়। সোহরাওয়ার্দ্দী সাহেব এলেন একটু পরে। উভয়ের মধ্যে খোশগল্প হলো কিছুক্ষণ। এর মধ্যে আকাশ মেঘ করে নামলো বর্ষা। প্রধানমন্ত্রী বললেন,–এমন সময়ে গান হলে ভালোই জমতো।

হারমোনিয়াম নিয়ে আসা হলো। আব্বাসউদ্দীন গাইলেন–

স্নিগ্ধ শ্যাম রেণী বর্ণা

এস মালবিকা- গানটি।

গান শেষ হলো। সোহরাওয়ার্দ্দী সাহেব বললেন,–কি গান যে গাইলে, আমি একটা বর্ণও বুঝতে পারলাম না।

—বাংলার প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে একথা আশা করতে পারিনি। হেসে বললেন আব্বাসউদ্দীন।

—কেন ? যার অর্থ বুঝিনি তা বলবো না ?

www.pathagar.com

— মুসলমানরা পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন করছে। বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশি। তাই বাংলাকে জানতে হবে, বাংলা ভাষাকে জানতে হবে। বাংলা ভাষা বুঝি না, এটা গৌরবের হতে পারে না।

— সুযোগ বুঝে বেশ লজ্জায় ফেললে আমাকে। অন্তত তোমার খোঁটা খাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য বাংলা শিখবো কোলকাতা ফিরে।

১৯৪৬ সালের ১৪ই আগস্ট মুসলিম লীগ 'প্রত্যক্ষ দিবস' ঘোষণা করলো। এই প্রত্যক্ষ দিবস হলো, মুসলিম সমাজ ও জাতীর উপর যে বে-ইনসাফী করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বিকাল চারটায় মনুমেন্ট ময়দানে তাই আহ্বান করা হয়েছে জনসভা। জনসভাতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান হাজির হতে লাগলেন।

হ্যারিসন রোডে রিপন কলেজ। এই কলেজকে কেন্দ্র করেই হিন্দু ছাত্র-রাজনীতিবিদদের রাজনীতি পরিচালিত হয়। মুসলমান ছাত্ররা চাইলেন প্রত্যক্ষ দিবসে তারা সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর পরিচালিত এই কলেজে পাকিস্তানী পতাকা তুলবেন।

পতাকা তোলা হলো। ছাত্ররা নিচে নেমে আসতেই কলেজের ছাদ থেকে শুরু হলো ইটের টুকরা ছোঁড়া। মুসলমান ছাত্ররা জখম হতে লাগলো ইটের টুকরায়। পাকিস্তানী পতাকা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো কলেজের ছাত্ররা।

এখান থেকেই শুরু হয়ে গেলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। চারটার দিকে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেব এলেন সভাতে। মঞ্চে উঠেই তিনি বললেন,– আজ সভা করার দিন নয়। কোলকাতার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আপনারা বাড়ি চলে যান।

এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চললো বেশ কয়েক দিন। বস্তি অঞ্চলে আগুন দেয়া হলো। দাঙ্গায় প্রাণ হারাতে লাগলো হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক। এর মধ্যে এসে গেলো মুসলমানদের রমজান মাস। মুসলমানরা তো ইতোমধ্যে ঘরের ভিতর আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মসজিদে তারা তারাবি পড়তে যেতে পারে না। পুলিশ প্রশাসন ভেঙে পড়লো। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেব বাধ্য হয়ে মেলেটারী ডাকলেন। মেলেটারীদের কঠোর শাসনে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলো।

মানবতার এই চরম দুর্দিনে সাড়া দিলেন আব্বাসউদ্দীন। জীবন বিপন্ন করে কোলকাতার পথে পথে মাইকে গান গেয়ে বেড়াতে লাগলেন 'ও ভাই হিন্দু মুসলমান ভুল পথে চলি দোঁহারে দুজনে কোরো নাকো অপমান'।

www.pathagar.com

দাঙ্গার সময়ে আব্বাসউদ্দীন পরিবারকে পাঠিয়ে দিলেন কুচবিহারে। থাকেন বৌ বাজারের স্যাভয় হোটেলে। বৌ বাজার হিন্দু প্রধান এলাকা। ইসলামী গান গেয়ে ইতোমধ্যে আব্বাসউদ্দীন পরিচিত মুসলমান। প্রাণের ভয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন মুসলিম প্রধান এলাকা বেনিয়াপুকুর লেনে।

আব্বাসউদ্দীনের দরকারি সব কাগজপত্র স্যাভয় হোটেলে। কবি আজিজুর রহমান আব্বাসের ঘনিষ্ট বন্ধু। কাগজগুলো উদ্ধারের কথা বললেন তাকে।

কবি আজিজুর রহমান অসম সাহসী যুবক। তিনি তার এক হিন্দু বন্ধুর মোটরে চড়ে বৌ বাজারে এলেন। মোটর থেকে নামার সাথে সাথে হিন্দু যুবকরা তাকে চিনে ফেললো। তারা অপেক্ষাতে ছিলো আব্বাসউদ্দীনের। আজিজুর রহমানকে পেয়ে খুশি হলো তারা।

কবিকে দেখে হোটেলের ম্যানেজার বাবু ঘাবড়ে গেলেন। বললেন,–মহা সর্বনাশ করেছেন আপনি। আব্বাসউদ্দীনকে ধরার জন্য দাঙ্গাবাজ যুবকরা পাহারা দিচ্ছে। এর মধ্যে এসেছেন আপনি ?

—কথা বলার সময় নেই। আব্বাসের রুমটা খুলে দিন। ওর জরুরী কাগজপত্র নিয়ে যেতে হবে।

—নিয়ে যাবেন কি করে ? ওরা তো আপনাকে প্রাণে মেরে ফেলবে।

—সৃষ্টিকর্তা সহায়। সাথে বন্ধু নৃপেন সেন আছেন। ওর কাছে আছে দুই দুইটা পিস্তল।

কাগজপত্রগুলো নিয়ে কবি আজিজুর রহমান বাইরে এসেছেন। দেখলেন, নিচে লোকে লোকারণ্য। দাঙ্গাবাজরা খবর পেয়ে গেছে, আব্বাসউদ্দীন না এলেও তার বন্ধু এক কবি এসেছে। জিঘাংসা চরিতার্থের জন্য উন্মত্ত হয়ে এসেছে তারা।

বিপদ আঁচ করে নৃপেন সেন কবিকে তার দেহের আড়ালে থাকতে বললেন। তার দুই হাতে দুই পিস্তল। দাঙ্গাবাজদের উদ্দেশ্যে বললেন,–আমি আন্দামান ফেরত স্বদেশী নৃপেন সেন। আমার গুলী কখনো মিস হয়না। যে এগুবেন, প্রাণ হাতে এগুবেন।

তারপর মোটরে উঠে তারা সাঁ করে চলে এলেন ঐ এলাকা ছেড়ে।

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন বৃটিশ ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন। ভারতবাসীদের একমাত্র দাবী, স্বাধীনতা। বৃটিশও নীতিগতভাবে রাজী হলো। কিন্তু প্রশ্ন উঠলো, ক্ষমতা কাদের হাতে দেওয়া হবে। কংগ্রেসের হাতে না মুসলিম লীগের হাতে ?

www.pathagar.com

কংগ্রেস বলে উঠলো, আমরা একসাথে মিলে ক্ষমতা নিয়ে নিই। ইংরেজরা আগে বিতাড়িত হোক। তারপরে আমরা 'ভাই ভাই' আপোষ বাটোয়ারা করে নেবো।

কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে মুসলমানরা রাজী হলো না। 'ভাই ভাই' এর পরীক্ষা বহুবার হয়ে গেছে। কোলকাতায় মুসলমানরা যেভাবে নিগৃহীত হচ্ছে তাতে আর বিশ্বাস করা যায় না। মুসলিম লীগের নেতারা বললেন,–একখন্ড স্থান নিয়ে যদি পাকিস্তান গড়তে হয়, তাও গড়বো। কিন্তু ওদের সাথে আর নয়।

অবশেষে মুসলমানদের দাবী স্বীকৃতি পেলো। মাউন্ট ব্যাটেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী মেনে নিলেন। জিন্নাহ নিযুক্ত হলেন পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর হিসেবে।

আব্বাসউদ্দীন খুশি হলেন। তখন ঢাকায় রেডিও স্টেশন চালু হয়েছে। কারিগরি ক্ষমতাও রেডিওর বেড়েছে। পাকিস্তান রেডিওতে গান গাইতে হবে। ঢাকায় রেকর্ডিংয়ের কোনো সুবিধা নেই। ঢাকা রেডিওর জন্য আপাতত কোলকাতা থেকে গান রেকর্ডিং করে নিয়ে যেতে হবে।

আব্বাস গেলেন গ্রামোফোন কোম্পানীর সোম বাবুর কাছে। পাকিস্তানের জন্য দুইটা গান রেকর্ডিং করতে চান। সোমবাবু রাজী হলেন। ঠিক হলো, কবি গোলাম মোস্তফাকে দিয়ে দুইটি গান লেখানো হবে। কবি আর শিল্পী দুইজন মিলে করবেন তার সুর সংযোগ।

'সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা দুনিয়াতে ভাই সে কোন স্থান' এবং 'ঝির ঝির ঝির পুবাল বাতাস ধাও' দুইখানা গান ঠিক হলো। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো যন্ত্রীদের নিয়ে। গ্রামোফোন কোম্পানীতে কোনো মুসলমান যন্ত্রী নেই। পাকিস্তানের গানে যন্ত্রী হিসেবে কেউ সাহায্য করতে রাজী হলো না। বাধ্য হয়ে আব্বাসউদ্দীন ইংলিশ অর্কেস্ট্রার সাথে যোগাযোগ করলেন। তারা গানের স্বরলিপি ইংরেজিতে লিখে দিতে বললো। আব্বাস তাই করলেন। তখনো কোলকাতাতে দাঙ্গা চলছে। অতি গোপনীয়তার মধ্যে গান দু'খানি রেকর্ড করা হলো। আব্বাস তা নিজের সংগ্রহে রাখলেন।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেলো। কোলকাতার দাঙ্গা আব্বাসের মনকে নাড়া দিয়েছে। রেডিও পাকিস্তান থেকে গান গাইতে হবে। আব্বাসকে তাই আগেই চলে চলে আসতে হবে ঢাকাতে এমনই নির্দেশ দিলেন নেতারা। কোলকাতা ছাড়তে বিষণ্ন হয়ে পড়লো আব্বাসের মন। অনেক কিছু তিনি পেয়েছেন এই শহরে। তার যশ, সম্মান, প্রতিপত্তি সবকিছুর লীলাক্ষেত্র এই কোলকাতা।

১৪ই আগস্ট শবে কদরের রাত। ঠিক রাত বারোটায় ঢাকা রেডিও থেকে প্রচারিত হলো আল্লাহ পাকের বাণী। তার পরপরই আব্বাসউদ্দীনের সৌভাগ্য হলো প্রথম গান গাইবার। ইথরে ইথরে ছড়িয়ে পড়লো আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠ।

সকালে আব্বাসউদ্দীন প্রচার বিভাগের গাড়ি চড়ে প্রভাত ফেরিতে বের হলেন একাকি। মোটরে মাইক বসিয়ে সারা ঢাকা শহরে গান গেয়ে ফিরলেন তিনি। সে এক আশ্চর্য শিহরণ।

আব্বাস তো প্রাণের টানে চলে এলেন ঢাকায়। স্ত্রী পুত্ররা রয়ে গেছেন কুচবিহারে। কুচবিহার একটি করদ রাজ্য। রাজার নাম মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভুপবাহাদুর। দেশ ভাগ হবার বেশ কয়েকমাস আগে থেকেই তিনি যোগাযোগ রাখছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দ্দীর সাথে। '৪৭ এর পরে করদ রাজ্য থাকবে না। পাকিস্তান কিংবা হিন্দুস্তানে যোগদান করতে হবে রাজাদের। কুচবিহারের মহারাজা চান পাকিস্তানে যোগদান করতে। এই জন্যই সোহরাওয়ার্দ্দীর কাছে তার যাওয়া।

—কুচবিহার নিয়ে আমরাও বিশেষ চিন্তায় আছি। আগে পাকিস্তান সৃষ্টি হোক, তারপর জিন্নাহর সাথে বসে বিষয়টা সমাধান করবো। আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

—কিন্তু সে সময় কোথায় ? আমাকে এখনই দিতে হবে পাকিস্তান কিংবা হিন্দুস্তানে অন্তর্ভূক্তির সিদ্ধান্ত। ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন মহারাজা।

—আর কয়েকটা দিন। এখন নেতারা পাকিস্তানের রূপরেখা নিয়ে ব্যস্ত। কুচবিহার নিয়ে মাথাব্যথা কম তাদের।

বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন মহারাজা। পাকিস্তানের ওজারতি নিয়ে নেতারা সত্যিই মহাব্যস্ত। পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হতে চান নাজিমউদ্দীন। সোহরাওয়ার্দ্দী তো আদাজল খেয়ে লেগেছেন এই পদটি তার দখলে রাখতে। কুচবিহার নিয়ে কে আর চিন্তা করে ?

www.pathagar.com

মহারাজাকে তাই বাধ্য হয়ে যোগদান করতে হলো হিন্দুস্তানে। কুচবিহারের মুসলমানরা অনেকেই বাস করার জন্য চলে আসতে লাগলেন পাকিস্তানে। কুচবিহারের তিন দিকে পাকিস্তান। হিন্দুস্তান হতে পারেনি, তার আগেই মুসলমানদের শুনতে হচ্ছে নানা রকম বিদ্রুপ। চাচারা আর কেন, পাকিস্তানের জন্য খুব কেঁদেছেন। এবার চলে যান সেখানে।

কুচবিহার ভারতের অন্তর্ভূক্তি হওয়াতে আব্বাস মুষড়ে পড়লেন। তার জন্মভূমি, তার স্বপ্নের দেশ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেও তার উপায় নেই। কোলকাতায় যে বিরূপ পরিবেশের মধ্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছে, দাঙ্গার সময়ে তিনি যে ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন তা ভাবলে শিউরে উঠেন। কুচবিহারে তার পৈত্রিক যে সম্পত্তি আছে তাতে পায়ের উপর পা দিয়ে আরাম আয়েশে তিনি চলতে পারবেন সারা জীবন। কিন্তু মুসলমানদের একটা আবাসভূমি সৃষ্টি হওয়াতে তিনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। তার মনে হলো, এই আবাসভূমিতে জন্ম নিবে খালেদ, মুসা, তারেক। স্থায়ীভাবে তাই তিনি চলে এলেন ঢাকায়।

যোগদান করলেন ঢাকার চাকরিতে। কোলকাতা থেকে তখনও ফাইলপত্তর এসে পৌছায়নি। রেডিওতে যান নিয়মিত। মাঝে মাঝে গান গাইতে হয় বিনা পারিশ্রমিকে। ঢাকাতে এলো না কোনো রেকর্ড কোম্পানী। নতুন রেকর্ড তৈরি হতে পারলো না বলে গ্রামে-গঞ্জে যে গ্রামোফোন যন্ত্রগুলো ছিল তাও অকেজো হয়ে পড়তে লাগলো। ধনী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এলো না রেকর্ড কোম্পানী গঠন করতে। আব্বাসউদ্দীনের কিন্তু ক্লান্তি নেই। মন্ত্রীদের সাথে যান বিভিন্ন সভা সমিতিতে। গান গেয়ে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন সাধারণ মানুষদের। কিন্তু বয়স হওয়াতে আগের মতো আর জোর পান না।

আব্বাসউদ্দীন সবচেয়ে বেশি অনুভব করেন কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিরহ-ব্যথা। কবিকে তিনি অফুরন্ত গান লেখার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। কবি এখন বোবা, সম্বিতহারা। কলম তার বন্ধ। এই বেদনাতেই আব্বাস হয়ে গেলেন অর্ধেক।

কুচবিহার হিন্দুস্তানের মধ্যে পড়াতে আব্বাস পাকিস্তানের পক্ষেই তার মতামত প্রদান করেছেন। এখন ছেলেমেয়েদের ঢাকায় আনতে হবে। লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সবচেয়ে আগে দরকার একটা থাকার স্থান যোগাড় করা।

বহু কষ্টে নারিন্দার ওয়ারী এলাকায় একটা বাসা পাওয়া গেলো। আব্বাস কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে গেলেন কুচবিহারে। হিন্দুস্তান-পাকিস্তান ভাগ হওয়াতে

www.pathagar.com

কুচবিহারের লোকেদের সেই মানসিকতা আর নেই। আব্বাসউদ্দীন মুসলিম লীগের নেতাদের সাথে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরেছেন। মুসলমানদের জন্য একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনমত সৃষ্টি করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই চলে এসেছেন ঢাকাতে। পাকিস্তানের জন্য উদ্বোধনী গান গেয়েছেন রেডিওতে প্রথম। অপরাধ তো তার কম নয়। তাকে আর বিশ্বাস করবে কেন হিন্দুস্তানের লোকেরা। তাই বাধ্য হয়ে তার বাপ-দাদার ভিটা ছাড়তে হলো। তার স্বপ্নের দেশ, তার কাব্যিক জন্মভূমি ছাড়তে হলো চিরদিনের জন্য।

ছেলে মেয়েদের তো ঢাকায় আনা হলো। এবার ভর্তি করে দিতে হবে স্কুলে। সেন্ট গ্রেগরীজ ছেলেদের জন্য সবচেয়ে ভালো স্কুল। খ্রীষ্টান মিশনারীদের স্কুল বলে লেখাপড়ার বিষয়ে খুবই কড়াকড়ি। এখানেই ভর্তি করে দেওয়া হলো তার দুই ছেলেকে।

মেয়ে ফেরদৌসীকে ভর্তি করার জন্য নিয়ে গেলেন কনভেন্ট স্কুলে। এটিও ইংরেজী মিডিয়াম স্কুল। ফেরদৌসী কুচবিহারে নিতান্ত সাধারণ মানের স্কুলে পড়েছেন। পাদরী প্রধান শিক্ষক তাকে ভর্তি করতেই চান না। পরীক্ষার আর মাত্র তিন মাস বাকী। এই সময়ের মধ্যে কিছুতেই এই মেয়ে পারবে না ক্লাসের সব বিষয় আয়ত্তে আনতে।

কর্মব্যস্ততার তাগিদে এতোদিন ছেলেমেয়েদের নিকট হতে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ছিলেন আব্বাসউদ্দীন। এবার সময় পেলেন। ফেরদৌসীর ইংরেজী শেখাবার জন্য বড় বড় তিনটা খাতা বানানো হলো। স্কুলের বইয়ের প্রতিটি ইংরেজী শব্দের মানে লিখে দিলেন। আদর করে কাছে বসিয়ে সেগুলো মুখস্ত করাতে লাগলেন মেয়েকে। স্কুলে সাপ্তাহিক পরীক্ষায় মেয়ে ভালো করতে লাগলেন। মেয়েকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আব্বাস কিনে আনেন এক একটি পুরস্কার। কখনো বই, কখনো মাথার ফিতে, কখনো বা সুন্দর দেখে কলম।

শুরু হলো বার্ষিক পরীক্ষা। ছেলেরা ভালোই করলেন। ফেরদৌসী করলেন আরো ভালো। ইংরেজীতেই বেশি নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হলেন চতুর্থ শ্রেণীতে। আব্বাসউদ্দীন মেয়ের এই কৃতিত্বে মহা খুশি। চোখে তার আনন্দের অশ্রু। মেয়ের মধ্যে খুঁজে পান তিনি তার মায়ের প্রতিচ্ছবি। কুচবিহারে থাকতে কোলকাতা হতে আব্বাস সুন্দর সুন্দর জামা কিনে আনতেন মেয়ের জন্য। তা দেখে আব্বাসের মা হাসিমুখে বলতেন,-আব্বাস তার মেয়েকে এতো যে ভালোবাসে, মনে হয় সম্পত্তি সব এই কালো মেয়েটাকেই লিখে দেবে। ঢাকায় এসে মেয়ে তার পিতার মনের কথাটা বুঝতে পেরেছে, এতেই আব্বাস খুশি।

www.pathagar.com

কুচবিহারের বাড়ি বিনিময়ে ঢাকায় একটি বাড়ি পাওয়ার আবেদন করেছিলেন তিনি পাকিস্তানে এসেই। সেই সুযোগ এসে গেলো। তোপখানা রোডের কাছে ঢাকার 'রাইটার্স বিল্ডিং' হলো ইডেন বিল্ডিং। সরকারী সব দপ্তর এই বিল্ডিংয়ে অবস্থিত। এর সামনে পল্টন এলাকায় একটা বাড়ি পাওয়া গেলো বিনিময় সূত্রে। স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে আব্বাস এসে উঠলেন এখানে।

কুচবিহারের বাড়ির তুলনায় এই বাড়ির আয়তন অনেক ছোট। কিন্তু সেটা পুষিয়ে গেলো বাড়ির সামনে সুন্দর একটি খোলা আঙ্গিনা পেয়ে। ছোটবেলা থেকে আব্বাসের শখ নানা ধরনের ফুলের বাগান করা। এই বাড়িতে তা করা যাবে বাড়িটার সামনের এই জায়গাটিতে।

বাড়িটা পেয়ে আব্বাসের প্রথমেই মনে হলো তার মায়ের কথা। আজ তিনি যে 'আব্বাসউদ্দীন' হতে পেরেছেন তার জন্য রয়েছে মায়ের অপরিসীম ত্যাগ, সন্তানকে বড় মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার আকাঙ্খা। ছেলে মানুষ হবে– এই ভেবে ছোটবেলাতেই তিনি ছেলেকে দিয়েছেন হোস্টেলে রেখে পড়াতে। বাঙ্গালী নারীর সেই অতি স্নেহের আঁচলে বেঁধে রাখেননি ছেলেকে। হোস্টেলে পাচকের হাতে খেয়ে পেটে চর পড়েছে, ভালোমন্দ খেতে পারেননি বলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়নি কখনো, পারেননি নাদুস নুদুস চেহারা গড়তে। কিন্তু মা এসব কিছুকে উপেক্ষা করেছেন ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। ছেলের বর্তমান অবস্থান, তার কৃতিত্ব দেখে মা কতোই না আনন্দ পেতেন বেঁচে থাকলে। হৃদয়ের বিশাল পর্দা জুড়ে মায়ের যে স্মৃতি সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন আব্বাস উদ্দীন তার মূল্য দিলেন তিনি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখার জন্য বাড়িটার নাম রাখলেন 'হীরামন মঞ্জিল'। মায়ের নামেই নাম।

এদিকে অফিসে তেমন কোনো কাজের চাপ নেই। পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য নেতারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। পাকিস্তান হাসিল হয়েছে। এখন ওজারতি নিয়েই তারা ব্যস্ত। মুসলমানদের স্বতন্ত্র একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আব্বাস উদ্দীনও কম পরিশ্রম করেননি। নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছেন এই একটি কারণে। এবারে সময় এলো পরিবারের দিকে নজর দেয়ার।

আব্বাসউদ্দীন রাজনীতিবিদদের সাথে ঘুরেছেন, অন্তরঙ্গ আলোকে তাদের দেখেছেন। কিন্তু তিনি রাজনীতি শেখেননি, তিনি শিখেছেন সমাজনীতি। রাজনীতিবিদদের চরিত্রে যে দুইটি সত্তার উপস্থিতি রয়েছে এটাকেই বরাবর ঘৃণা করে এসেছেন তিনি। বিশেষ করে তার অন্তর দুমড়ে গেছে কাজী নজরুল ইসলামের মস্তিষ্ক বিকৃতির পরে রাজনীতিবিদদের প্রকৃত চেহারা দেখে। এইসব নেতা কাজী নজরুলকে ব্যবহার করেছেন। মুসলমানদের জাগানোর জন্য,

www.pathagar.com

অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠার জন্য নজরুলের লেখনীর সুযোগ নিয়েছেন। মুসলমানরা যখন সোচ্চার হয়েছে, রাজনীতিবিদরা সুসংহত করতে পেরেছেন তাদের ওজারতির আসনটি, নজরুলকে তখন ঠেলে দিয়েছেন দূরে। কাজ তাদের উদ্ধার হয়েছে, ওজারতিও পাকাপোক্ত–অসুস্থ নজরুলের প্রয়োজন নেই তাদের।

রুচিবান পুরুষ আব্বাসউদ্দীন এগুলেন তার পথ ধরেই। কোলকাতা থেকে খ্যাত অখ্যাত কলম যোদ্ধারা এসেছেন ঢাকাতে। মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমিকে তারা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না।

এই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দায়িত্বটাই হাতে নিলেন আব্বাসউদ্দীন। তার বাড়ির একটা রুমকে বরাদ্দ রাখা হলো এই কাজে। একেবারে বাঙালী আটপৌরে সাজে সাজানো হলো রুমটি। বসার জন্য রইলো না কোনো চেয়ার টেবিল। কার্পেটের উপর ধবধপে সাদা কাপড় দিয়ে মোড়া হলো ঘরটি। আব্বাসের সাদা প্রচ্ছন্ন মনের প্রতিফলন পড়লো রুমটির সাজ গোজের ভিতর।

দাওয়াত দেওয়া হলো কবি সাহিত্যিকদের। নির্দিষ্ট দিনে হাজির হলেন তারা আব্বাসউদ্দীনের বাড়িতে। এলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কবি গোলাম মোস্তফা, খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন, বন্দে আলী মিয়া, বেগম শামসুন নাহার, কবি তালিম হোসেন, কবি আবদুর রশিদ খান, কবি ফররুখ আহমেদ প্রমুখ।

— আপনি গায়ক হিসেবে সারা দেশে মশহুর। কিন্তু দাওয়াতের তালিকায় কবি সাহিত্যিকদের নাম। নতুন কোনো পত্রিকা বের করার ইচ্ছা আছে কি ? কৌতুক করে জানতে চাইলেন অভ্যাগতদের একজন।

—আকরাম খাঁ থাকতে সে চিন্তা আমি করি কেন ? কবি সাহিত্যিকগণ সমাজের বিবেক হলেও সমাজের মানুষ তাদের মূল্যায়ন করে না। আমি শুধু তাদের এই ক্ষতস্থানটায় একটু আদরের পরশ বুলাতে চাই। এর চেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো কবি সাহিত্যিকদের একটু বসার জায়গা করে দেয়া। কৈফিয়ৎ দিলেন আব্বাসউদ্দীন।

—জায়গা ভালোই করেছেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে আপনার বাড়িটি। গেট থেকে ঢোকার মুখে পেলাম একটা পরিচ্ছন্ন ফুলের বাগান। ঘরটাও সাজিয়েছেন বাঙালী আর ইসলামী সংস্কৃতির আদলে। এখন ভাবির হাতের পায়েস আর গুড়ের শরবত খেতে পেলেই ষোল আনা পূর্ণ হয়।

—সে ব্যবস্থাও আছে। উপরি পাওনা হলো গান বাজনার আসর বসবে সাহিত্য আসরের পরে। আমিই গান শোনাবো আপনাদের।

www.pathagar.com

এভাবে চলতে লাগলো দিনগুলো। মাসে একবার তার বাসায় সাহিত্য আসর বসে। সন্ধ্যার আগেই ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে যায় পশ্চিম দিকের প্রশস্ত কামরাটি। শুরু হয় সাহিত্য সভা। এক মাসে কে কি লিখেছেন তা পড়ে শোনান এই সভাতে। লিখিত বিষয়টির উপর আলোচনাও করেন দু'একজন। এইভাবে সদ্য স্বাধীন দেশে নব্য একটা সাহিত্যিক গোষ্ঠী তৈরিতে সচেষ্ট রইলেন আব্বাস উদ্দীন। কোলকাতার বিরাট পরিমন্ডল থেকে দেশ বিভাগের কারণে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন তাদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হলো। একজন দরদী অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে চললেন তিনি।

রাজনৈতিক পরিমন্ডলে আবারো পরিবর্তন হলো। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ইন্তেকাল করলেন। তার জায়গায় অধিষ্ঠিত হলেন খাজা নাজিমউদ্দীন। পূর্ব বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন নূরুল আমিন। পশ্চিম পাকিস্তানের উজিরে আজম লিয়াকত আলী খান। প্রচার বিভাগের কাজও বেড়ে গেলো। নতুন প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রচার করা, তার ছবি ছাপিয়ে দেশময় বন্টন করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো প্রচার বিভাগ।

লিয়াকত আলী খান এলেন ঢাকাতে। সিলেটের একটা জনসভায় তিনি ভাষণ দেবেন। ডাক পড়লো আব্বাসউদ্দীনের। উদ্বোধনী আর সমাপ্তি সংগীত গাইতে হবে।

আব্বাস গাইলেন নজরুলের 'বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান' গানটি। এই গানটির লিখিত একটা ইংরেজী অনুবাদও এনেছেন তিনি পকেটে করে। সেটা রাখলেন বক্তৃতা টেবিলের উপর। এই অনুবাদের উপর ভিত্তি করে অগ্নিস্রাবী বক্তৃতা করলেন লিয়াকত আলী খান। পরে আব্বাসের এই বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন তিনি।

মাসিক সাহিত্য আসরের খবর প্রচার হয়ে গেলো ঢাকার সুধি মহলে। এবারে কণ্ঠ শিল্পীরা এসে ধরলেন আব্বাসকে।

—আমরা কি অপরাধ করলাম ? আপনার মতো 'কাব্য রত্নাকর' উপাধি আমাদের নেই। সাহিত্যের আসরে আসতে তাই লজ্জা পাই। সাহিত্য আসরের শেষে কি সংগীতের আসর করা যায় না ?

—যায়। কিন্তু দুই আসর একসাথে বসলে রাত হয়ে যাবে। ধৈর্য থাকবে কি আপনাদের ?

— সুযোগ দিয়েই দেখুন না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা জানবে আব্বাসউদ্দীন তার বাসাতে করতে পেরেছিলেন শিল্পী-সাহিত্যিকদের মিলন মেলা।

www.pathagar.com

প্রস্তাবটা আর ফেলতে পারলেন না আব্বাসউদ্দীন। প্রস্তুতি চলতে লাগলো সেভাবে। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন ঈদ, শবে বরাত, ফাতেহা ইয়াজদহম, মহররম, ইত্যাদি সামনে রেখে চললো আলোচনা সভা। সভা শেষে সংগীতানুষ্ঠান। এছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠান তো রয়েছেই। কথায়, গানে, গল্পে, কবিতায় প্রতিটি আসর হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। আসরে বসলে বাড়ি ফেরার তাগাদা থাকে না। রাত যে গভীর হচ্ছে সেদিকে হুস থাকে না কারো। এইভাবে 'হীরামন মঞ্জিল' হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের একটি প্রাণকেন্দ্র হিসেবে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ মুনসুরউদ্দীন লোক সংগীতের উপর গবেষণার কাজ করছিলেন। কান টানলে যেমন মাথা আসে লোক সংগীতের কথা উঠলেই আসে আব্বাসউদ্দীনের কথা। গুণী এই অধ্যাপক নিয়মিত তাই যাতায়াত শুরু করলেন হীরামন মঞ্জিলে। কোলকাতায় থাকাকালীন সময়ে কমলদাশ গুপ্তকে নিয়ে আব্বাসউদ্দীন বহু লোক সংগীত সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি তার এই সংগ্রহ দেখালেন গুণী এই গবেষককে। উপকৃত হলেন মুনসুরউদ্দীন। তিনিও গ্রামে গঞ্জে যেয়ে যা সংগ্রহ করেছেন আব্বাসকে দিয়ে তা গেয়ে শোনেন। এইভাবে অধ্যাপক সাহেবের গবেষণা কর্মে নিরাহংকার শিল্পী মানুষটি প্রভূত সাহায্য করলেন।

শুধু গান গেয়েই আব্বাসউদ্দীন যে জীবন অতিবাহিত করেছেন তা নয়। নামাজের প্রতি বড় পায়াবন্দ তিনি। ওয়াক্তের সময় ওয়াক্তের নামাজ পড়া তার জীবনের প্রধান গুণ। ঘড়ি ধরে তিনি ফজর, জোহর, আছর, মাগরিব, এশার নামাজ আদায় করেন। নামাজের বিষয়ে তার ছন্দপতন ঘটেনি কখনো। কোনো অনুষ্ঠানে গিয়েছেন, নামাজের সময় হয়েছে। ওজু করে নিয়ে নামাজ পড়ে নিয়েছেন। নামাজ পরে পড়া অর্থাৎ নামাজ কাজা করা ভারি অপছন্দ করেন তিনি।

ফজরের সময় হয় আরো প্রাণবন্ত। বাড়ির অনতিদূরে শহরের বড় মসজিদ। যতো রাতেই ঘুমান না কেন, ফজরের আজান দিলে উঠে পড়েন। ওজু করে দাঁড়িয়ে যান নামাজে। ফরজ দুই রাকাত নামাজ পড়েন দীর্ঘ সময় নিয়ে। নামাজে সুললিত কণ্ঠে শুরু করেন কোরআনের মুখস্ত সুরা। নামাজের মধ্যে কোরআনের এই মধুর ধ্বনি শুনে পরিবারের অন্যান্যরা উঠে পড়েন। বাড়িতে নির্দেশ রয়েছে তেমনই। ফজরের আজানের পরে আর ঘুমানো যাবে না। আজানের আস সালাতু খায়রুম মিনান নাউম–ঘুমের চেয়ে নামাজ উত্তম–এই বাণীর প্রতি সারা জীবন শ্রদ্ধাবোধ দেখিয়ে এসেছেন। দুই ছেলেও ওজু করে

www.pathagar.com

এসে দাঁড়ান তার পাশে। প্রভাতে হীরামন মঞ্জিল উদ্ভাসিত হয় বেহেশতী আভায়।

শুধু যে নিজে নামাজ পড়েন তা নয়। ছেলে মেয়েরা যাতে নামাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় সেদিকে রয়েছে তার সতর্ক দৃষ্টি। ছেলেদের নিয়ে জামাত করে নামাজ পড়েন। নামাজের ছোট ছোট বিষয়গুলো শিখিয়ে দেন তাদের। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য বিভিন্ন নবীর জীবনী কিনে এনে পড়তে দেন। শুদ্ধ করে কোরআন শরীফ পড়ার জন্য ঘরে শিক্ষক রেখে দিয়েছেন তাদের ছোটবেলা থেকেই।

এক রাতে বাড়িতে চোর ঢুকলো। কৌশলে জানালার কপাট খুলে ফেললো সে। এবার জানালার শিক বেকিয়ে ঢুকবে ঘরের মধ্যে। তা আর হলো না। ঘরের মধ্যে আব্বাসউদ্দীন আত্মসমহিত হয়ে তাহাজ্জদের নামাজ আদায় করছেন। অন্যের ঘুমের অসুবিধা হবে ভেবে নিচের ঘরে সন্তর্পণে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন। বিফল হতে হলো তাই চোরকে।

সুন্দরের প্রতি আব্বাসের প্রবল আকর্ষণ। ফুলকে ভালোবাসেন প্রাণের মতো। হীরামন মঞ্জিলের সামনে একটা খোলা জায়গা রয়েছে। ছোট এই আঙিনায় ফুলের গাছ লাগালেন তিনি। ফজরের নামাজ পড়ে নেমে পড়েন ফুল বাগানে। খুব যত্ন করে পরিচর্যা করেন প্রতিটি গাছকে। এক একটি গাছ যেন তার এক একটি সন্তান। গাছের সাথে কথা বলেন। যে সুর তার মনে দোলা দিচ্ছে ঘুরে ফিরে তার প্রথম শ্রোতা এই গাছগুলো।

ছোটবেলা বলরামপুরে থাকতে ফুল বাগান করার কথা কেবলই তার মনে হয়। ডাক বাংলোর মালীটি সত্যিই ভালো ছিল। তাকে ফুল ছিঁড়তে দেখে ফুল বাগান করার জন্য উৎসাহিত করেছে। তার দেয়া হাসনু হেনা, যুঁই, চামেলী, গন্ধরাজ, গোলাপ আরো কতো ফুলের গাছ তিনি লাগিয়েছিলেন তার বাগানে। এখানেও তাই করলেন। একদিন ছোট্ট মেয়ে ফেরদৌসী বাগানের ফুল ছিঁড়ে তার প্রিয় শিক্ষককে দিয়েছে। পিতা ব্যথিত হয়েছেন। কিন্তু কিছুই বললেন না মেয়েকে। ফুল প্রেমিক হৃদয়টি পরাজিত হয়েছে পিতৃ স্নেহের কাছে।

একদিন সকালে ফুলের বাগান পরিচর্যা করছেন আব্বাসউদ্দীন। এক ভদ্রলোক এলেন তার সাথে দেখা করতে। সালাম বিনিময় হলো। কিন্তু আব্বাস চিনতে পারলেন না তাকে।

—আমি তৈফুর। কোলকাতায় আপনার সাথে কথা হয়েছে। আমার তিন মেয়ে। আপনি একদিন এসেছিলেন আমার বাড়িতে।

—সেই ন্যাড়া মাথা ফ্রক পরা তিনটি ছোট মেয়ের পিতা আপনি ?

www.pathagar.com

—ঠিকই ধরেছেন। আপনার উপদেশ মতো আমার মেঝো মেয়েটাকে উচ্চাঙ্গ সংগীত শেখানোর জন্য ঢাকায় এসে ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খাঁর হাতে তুলে দিই। সেই মেয়ে এখন রেডিওতে প্রোগ্রাম করে। নাম লায়লা আর্জুমান্দ।

—লায়লা আপনার মেয়ে ? খুব সুরেলা কণ্ঠ। মুসলমান ঘরের মেয়ে রেডিওতে গান করছে। তাতেই আমি পুলকিত। সে যে সেই ন্যাড়া মাথার মেয়েটি তা আমার জানা ছিল না।

—তার মাথা এখন আর ন্যাড়া নেই। ফ্রকও পরে না। মেয়ে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। সামনে এম, এ পরীক্ষা।

—আরো আনন্দের খবর। একদিন নিয়ে আসুন তাকে।

—নিয়েই এসেছি। বাড়ির ভিতরে গিয়েছে আলাপ করতে।

আব্বাসউদ্দীন মেহমানকে নিয়ে বসলেন পশ্চিম দিকের সেই ঘরে। লায়লা এসে কদমবুছি করলো তার। বিশ বছর আগে আব্বাসউদ্দীন যে বলেছিলেন,–এই মেয়েকে গান শেখালে ভবিষ্যতে নামকরা শিল্পী হবে–সে কথা মনে রেখেছে মেয়েটি। এই একটু কথার জন্যই তার পিতা ঢাকায় বদলি হয়ে এসে তাকে ভালো ওস্তাদ দিয়েছেন। পর্দানসীন মুসলিম পরিবারের মেয়ে হয়েও আজ তিনি যে এই পর্যায়ে আসতে পেরেছেন তার মূলে আব্বাসের ঐ একটু অনুপ্রেরণা। লায়লা আর্জুমান্দ তা কি ভুলতে পারেন ?

হারমোনিয়াম আনা হলো। পর পর কয়েকটা গান গাইলেন লায়লা। তার গলার কারুকাজে চমৎকৃত হলেন আব্বাসউদ্দীন। লায়লা আগ্রহ দেখালো ভাওয়াইয়া গানের প্রতি। ভাওয়াইয়া গানের সম্রাটের বাড়িতে এসে খালি হাতে ফিরে যেতে সে রাজী নয়।

কয়েকটা ভাওয়াইয়া গানের সুর আব্বাস তাকে ধরিয়ে দিলেন। দু'বারের বেশি দেখাতে হলো না। তার এই প্রতিভা মুগ্ধ করলো আব্বাসকে। তৈফুর সাহেবকে বললেন,–আপনার এই 'ব্লটিং পেপার' মেয়েটিকে মাঝে মাঝে নিয়ে আসবেন আমার কাছে।

বেশ একটা হাসির রোল পড়ে গেলো ঘরের মধ্যে। এক ঘন্টায় আটখানা ভাওয়াইয়া গানের সুর কণ্ঠে উঠিয়ে নেয়া ব্লটিং পেপারই বটে।

দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। চারদিকে নানা সমস্যা। শস্য শ্যামলা এই দেশ, ধান পাটের এই দেশ। অবিভক্ত বাংলায় এই দেশের উৎপন্ন ধান পাট চলে যেতো কোলকাতা ও তার আশপাশের শহরে। দেশ ভাগ হওয়াতে এই দেশের ধান এদেশেই রইলো। তাতে ভারি বিপদে পড়লো হিন্দুস্তানের লোকেরা। বরিশাল দিনাজপুরের চাল আর ওদিকে যায় না। এদেশে ধান চালের দাম

www.pathagar.com

কমলো আর ওদিকে তা বাড়লো। বেশি দামের লোভে সীমান্তে চোরাচালান শুরু হয়ে গেলো। সরকারী প্রচার বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হলো এই চোরাচালানের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করা, দেশপ্রেমে তাদের উদ্বুদ্ধ করা।

মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার আর আব্বাসউদ্দীন আবারো বেরিয়ে পড়লেন। এবারে তারা গেলেন সীমান্তবর্তী শহরগুলোতে। মন্ত্রী বক্তৃতা দেন আর আব্বাসউদ্দীন গান শুনিয়ে জনগণের মনোবলকে চাঙ্গা করে তোলেন। সবে আনছার বাহিনী গঠিত হয়েছে। আব্বাস আনছার বাহিনীর ক্যাম্পে যেয়ে জোয়ানদের 'ওরে ও মোমিন ভাই তুই করিস কেন ভয়' আর 'পাকিস্তানের কওমী ফৌজ আমরা পাহারাদার' গান দু'খানি শিখিয়ে দিয়ে আসেন।

ছেলে মোস্তফা জামান আব্বাসী আর মেয়ে ফেরদৌসী এতোদিন পিতার কাছেই গানের তালিম নিচ্ছিলেন। পিতার সাথে মেয়ের যতো কথা। আব্বাই তার বড় বন্ধু। স্কুল থেকে ফিরে স্কুলে কি কি ঘটলো তা একে একে বলতে হয় আব্বাকে। ছেলেরাও তাই। মোস্তফা জামান বায়না ধরলেন, নাচ শিখবেন। গয়ের রং ফর্সা, দেখতে সুন্দর, হাত-পা লম্বা লম্বা, নাকটাও খাড়া। নাচে তাকে মানাবে ভালো–এই যুক্তি দিয়েছেন স্কুলের এক বন্ধু। আব্বাসউদ্দীন দ্বিধা করলেন না। ছেলের জন্য নাচের শিক্ষক রেখে দেওয়া হলো। শিক্ষকের কাছে মোস্তফা জামান আব্বাসী বেশ কয়েক মাস নাচ শিখলেন। লম্বা মানুষ, নাচের তাল ঠিক রাখতে যেয়ে অল্পতেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। নাচ শিখছেন দেখে কোনো কোনো বন্ধু তাকে ক্ষেপাতে লাগলো। বললো,–আব্বাসী নাচ শিখছে, কিছুদিন পরে চুড়িও পরবে।

আত্মসম্মানে লাগলো মোস্তফা জামান আব্বাসীর। ভাবলেন, এ কাজ তার নয়। বিদায় দেওয়া হলো নাচের শিক্ষককে। এবার বায়না ধরলেন, তবলা শিখবেন। পিতা আবারো রেখে দিলেন শহরের সেরা তবলচীকে। বজলুল করিম সাহেব যত্ন করে তবলা শেখাতে লাগলেন।

ফেরদৌসীর বায়না আবার অন্য রকম। তিনি শিখতে চাইলেন উচ্চাঙ্গ সংগীত। তাতেও কোনো অমত নেই পিতার। ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু, ওস্তাদ মুনির হোসেন খান, ওস্তাদ মুন্সি রইচউদ্দীন, ওস্তাদ কাদের জামেরী আরো কতো গুণী ওস্তাদের কাছেই না তালিম নিতে লাগলেন ফেরদৌসী। ছেলে মেয়েদের কাছে আব্বাস প্রায়ই তার ছোট বেলার গান শেখার কথা বলেন। তাকে কেউ গান শেখায় নি। তিনি শিখেছেন প্রকৃতির নিকট হতে। নিজে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছেন বলে সন্তানদের বেলায় তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। যে যেদিকে যেতে চায় পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

নতুন দেশ পাকিস্তান সফরে এলেন চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই। ঢাকার গুলিস্তান সিনেমা হলে তাকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করা হলো। শুরু হলো অনুষ্ঠান। আব্বাসউদ্দীনের দায়িত্ব পড়লো একটা পল্লীগীতি শোনাবার। তিনি গাইলেন 'আল্লা মেঘ দে পানি দে' গানখানি। দোভাষীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জেনে নিলেন গানখানির মর্মবাণী।

অনুষ্ঠান শেষ হলো। হল ঘর ছেড়ে দর্শকরা এলেন বাইরে। কিন্তু কী অবাক কান্ড। বাইরে তখন শুরু হয়েছে ঝমঝম বৃষ্টি। হলে যখন তারা ঢুকেছিলেন, আকাশে একখন্ড মেঘও ছিল না। তারকা খচিত নির্মল মেঘমুক্ত আকাশে অভাবিত এই বৃষ্টি সত্যিই আনন্দ দিলো দর্শকদের।

ঢাকা ত্যাগ করার সময় চীনের প্রধানমন্ত্রী বিমানে উঠার আগে খোঁজ করলেন আব্বাসউদ্দীনের। কিন্তু আব্বাস তো বিমান বন্দরে যাননি। একজন কর্মকর্তা তাই জিজ্ঞাসা করলেন,–কিছু খবর কি জানাতে হবে আব্বাসউদ্দীনকে ?

— হ্যাঁ, আমি হয়তো সময়ের ব্যবধানে সবকিছু ভুলে যাবো। কিন্তু একটা জিনিস স্মৃতির মণিকোঠায় দীর্ঘদিন দাগ কেটে থাকবে। তা হলো, এদেশের শিল্পী গান গেয়ে বৃষ্টি ঝরাতে পারে।

আব্বাসউদ্দীনের শিল্পী জীবনের সাথে ব্যক্তি জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে রয়েছে। তার চাল-চলন অত্যন্ত সাদাসিধে কিন্তু রুচিশীল। কতো নামী-দামী লোক আসেন তার কাছে গান নিয়ে। মন্ত্রী আসেন, রাজনীতিবিদ আসেন, শক্তিধর লেখক আসেন, খ্যাতমান কবি আসেন। আব্বাস যদি একটু কণ্ঠ দেন তাদের লিখিত গানে। তার কণ্ঠের সিঁড়ি বেয়ে জনমনে ঠাঁই করে নিতে চান তারা। কিন্তু গানের বাণী প্রায়ই ক্ষেত্রে রুচিতে বেধেছে বলে আব্বাস তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন বিনয়ের সাথে। অথচ এই আব্বাসই গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়িয়ে পল্লী সংগীতের ভান্ডার থেকে সংগ্রহ করে চলেছেন অসংখ্য ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদী গান। গীতিকারের পরিচয় জানা নেই, হয়তো অখ্যাত কেউ হবেন। কিন্তু গানের সুর, ছন্দ, বাণী তার ভালো লাগলেই তা সংগ্রহ করেছেন। নিজ কণ্ঠে উঠিয়ে নিয়ে তা নব পরিচয়ে পরিচিত করেছেন জনমানবে। এইরূপ বিশাল হৃদয়ের এই মানুষটি শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন আপামর জনগণের কাছে মার্জিত, পরিশীলিত, রুচিবান ব্যক্তিত্ব হিসেবে।

সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ এলেন ঢাকাতে। শিল্পী মহলে সাড়া পড়ে গেলো। আব্বাসউদ্দীন একদিন খুব তাজিমের সাথে নিয়ে এলেন শিল্পীকে তার বাসায়। আয়োজন করা হলো গানের জলসার। অনেক নামকরা শিল্পীই গাইলেন। ফেরদৌসী গাইলেন রাগ ভৈঁরো।

www.pathagar.com

ছোট্ট এই মেয়ের কণ্ঠে রাগ ভেঁরোর অপূর্ব ব্যঞ্জনায় মোহিত হলেন ওস্তাদজী। খুবই প্রশংসা করলেন তিনি ফেরদৌসীকে।

পরদিন সকালেই মেয়েকে তৈরি হতে বললেন আব্বাস। নিয়ে গেলেন তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর কাছে গান শিখছিলেন ফেরদৌসী। এই ওস্তাদজী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছেন। সেখানেই নিয়ে এলেন মেয়েকে। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ ফেরদৌসীর গানের প্রশংসা করেছেন। এই প্রশংসায় খসরু সাহেবেরও অংশ আছে। তাই জানাতে এসেছেন কৃতজ্ঞতা।

দেশ বিভাগের পরে আব্বাস ঢাকাতে এলেও তার আত্মীয়-স্বজন সবাই ঢাকাতে আসেননি। তারা রয়ে গেলেন কুচবিহারে। প্রথম দিকে পাসপোর্ট প্রথা চালু হয়নি বলে রংপুর হয়ে তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা সহজ ছিল। পাসপোর্ট প্রথা চালু হওয়াতে বিষয়টা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। তাছাড়া চোরাচালান ও অন্যান্য কারণে হিন্দুস্তানের সাথে সম্পর্কটা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তিক্ততায় পর্যবসিত হলো। আব্বাস তার ছোট ভাই আবদুল করিমকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। কোলকাতায় থাকতে তাকে দিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় নাটিকা লিখিয়েছেন, ভাওয়াইয়া গান লিখিয়েছেন। নিজে কণ্ঠ দিয়েছেন তাতে। ছোট ভাই আবদুল করিম কুচবিহারের মায়া ত্যাগ করে ঢাকাতে এলেন বড় ভাইয়ের স্নেহের ছায়াতলে থাকবেন বলে।

অন্যান্য যে সব আত্মীয়-স্বজন রয়ে গেলেন কুচবিহারে আব্বাস নিয়মিত তাদের সাথে পত্র বিনিময় করেন। তাদের খোঁজ-খবর রাখেন। চিঠি লেখা তার একটা শখ। সুন্দর গোটা গোটা মুক্তার মতো তার হাতের লেখা।

পিতা-মাতার মাজারটা বলরামপুরে থাকায় আগের মতো আব্বাস আর নিয়মিত জেয়ারত করতে পারেন না। ঢাকার বাসায় প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে তাই দোওয়া খায়েরের ব্যবস্থা করলেন। ছেলে মেয়েদেরও এই দোওয়া মাহফিলে নিজের কাছে বসান। তাদের শিক্ষা দেন, বৃহস্পতিবার রাতে আল্লাহতায়ালা রুহদের মুক্তি দেন। তারা পৃথিবীতে আসেন। দেখেন তাদের রেখে যাওয়া ওয়ালিদরা তাদের জন্য খোদার দরগাহে ক্ষমা প্রর্থনা করছে কিনা। কিছু না করলে তারা খালি হাতে অপরাধীর মতো ফিরে যান আল্লাহর দরবারে। আর তার ওয়ালিদরা দোওয়া খায়ের করলে তারা ফিরে যান খুশি মনে।

www.pathagar.com

ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত দেওয়া হলো সে অনুষ্ঠানে। দাওয়াত পেলেন আব্বাসউদ্দীনও।

হলঘরে যেয়ে আব্বাস দেখলেন, তার উপরের কর্মকর্তা কবি জসিমউদ্দীন দর্শক সারির প্রথমে বসে আছেন। সরকারী দপ্তরের বড় কর্তা এবং কবি হিসেবে দাওয়াত পেয়েছেন তিনিও।

ইদানীং আব্বাসউদ্দীনের সাথে তার বনিবনা হচ্ছিল না। ভারত ভাগ হয়েছে। গঠিত হয়েছে পাকিস্তান। জসিমউদ্দীন ফরিদপুরের ছেলে। আব্বাস উদ্দীন হিন্দুস্তানের কুচবিহারের। পাকিস্তানে তিনি রেফিউজী। একই অফিসে কাজ করেন। জসিমউদ্দীনের অধীনে আব্বাসউদ্দীনের চাকুরি। কিন্তু খ্যাতির দিক দিয়ে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন বড়কর্তাকে। তাই সামান্য কারণেই তাদের মধ্যে বাধে খিটিমিটি। কথা বলা বন্ধ করে দেন জসিমউদ্দীন। অফিসের বড় কর্তা হিসেবে সে অধিকারও তার আছে। আব্বাস মর্মাহত হন। অভিমান করে তিনিও কাছে ঘেঁসেন না পল্লী কবির।

জলসার কাজ শুরু হলো। চললো কবিতা আবৃত্তি, কৌতুক পরিবেশন। তারপর ডাক পড়লো আব্বাসউদ্দীনের গান শোনানোর। মাইকে নাম ঘোষিত হবার সাথে সাথে শুরু হলো করতালির প্রতিযোগিতা। দর্শকরা তো আব্বাস উদ্দীনের বড়কর্তা নন। শিল্পীকে সম্মান করতে কৃপণতা করবেন কেন ?

পল্লীকবির মন গেলো আরো বিগড়ে। শিল্পীর প্রতি অভিমান হয়েছিল তার খুব বেশি। শিল্পীর মুখোমুখি হবেন না ভেবে চোখ বন্ধ করে রইলেন কিছুক্ষণ।

আব্বাসউদ্দীন ঢুকলেন মঞ্চে। পরনে গ্রাম্য চাষীর লুঙ্গি। মাথায় ফরিদপুর এলাকার চাষীর ব্যবহৃত মাথাল। মুখে আঠা দিয়ে লাগানো তুলোর সাদা দাড়ি। হাতে তামাক খাওয়ার হুকো। দর্শকদের করতালি যে থামছিল না এটাই তার কারণ।

মাইকে ভেসে এলো আব্বাসের কণ্ঠ 'ও বাজান চল যাই চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে'। দর্শকরাও সুর তুললো শিল্পীর সাথে।

নিজের গান শুনে জসিমউদ্দীন কি আর চুপ থাকতে পারেন ? চোখ মেললেন। আব্বাসকে তার এলাকার গ্রাম্য চাষীর বেশে দেখে আরো হলেন উদ্বেলিত। অভিমান ভুলে গেলেন তিনি। এমন দরাজ দিলের বন্ধুর সাথে কি মন কষাকষি করা চলে ? কৃতজ্ঞতায় চোখে পানি এলো তার। শহরের গণ্যমান্য লোকের উপস্থিতিতে তারই গান গাওয়া, গানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চাষীর পোশাক পরা, আনন্দ রাখবেন কোথায় জসিমউদ্দীন ?

www.pathagar.com

শ্রোতা দর্শকদের মাতিয়ে শেষ করলেন আব্বাসউদ্দীন তার গান। পোশাক পাল্টিয়ে চলে এলেন দর্শকদের আসনে। জসিমউদ্দীনের পাশে এসে বসলেন ঠেলেঠুলে। জিজ্ঞাসা করলেন,–কেমন হলো কবি ?

মঞ্চে তারই গান গাওয়া আবার পাশে এসে বসা। আগ বাড়িয়ে কথা বলা, অভিমান কি আর থাকে ? শিল্পীকে বুকে টেনে নিলেন কবি। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন,–তোমার গলা ছাড়া আমার পল্লী এই গান কি আর কারো গলায় মানায় ?

কোথায় রইলো মান-অভিমান ? দুইজন খোশ গল্পে মত্ত রইলেন। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত কথাগুলো যেন এক সাথে ঠেলেঠুলে বের হয়ে আসতে চায়। শিল্পীও একনিষ্ঠ শ্রোতা। এই সরলতার কারণেই সহজে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পেরেছেন আব্বাসউদ্দীন।

এক সকালে আব্বাসউদ্দীন বসে কাজ করছেন তার শখের ফুলবাগানে। এক একটি ফুলগাছ যেন তার এক একটি সন্তান। সকালে বেশ সময় ব্যয় করেন তিনি তার বাগান পরিচর্যায়। পানি দেন, গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দেন। গাছে ফুল ফোটানোর পেছনে তার চেষ্টার অন্ত নেই। এই সময়ে এক ইংরেজ ভদ্রলোক এলেন তার সাথে দেখা করতে।

ভদ্রলোক সামনেই পেয়ে গেলেন আব্বাসউদ্দীনকে। শিল্পীকে তো চেনে না। তাই বললো,–মালী, সাহেবকে খবর দাও।

আব্বাসউদ্দীন সাহেবকে বসার ঘরে নিয়ে এলেন। তাকে বসতে দিয়ে নিজে ঢুকে পড়লেন ভেতরের ঘরে। হাত পা ধুয়ে ধোপ দুরস্ত হয়ে ফিরে এলেন এবার।

সাহেবকে না ডেকে মালী আবার এসেছে দেখে বিরক্ত হলেন ইংরেজ ভদ্রলোক। বললেন,–আব্বাসউদ্দীনের সাথে আমি দেখা করতে এসেছি। দয়া করে তাকে ডেকে দাও।

—আমিই আব্বাসউদ্দীন। বিনয়ের সাথে নিজের পরিচয় দিলেন তিনি। তবুও সাহেবের ইতস্তত ভাব যায় না। মিথ্যে বলছে না তো লোকটা। বড় মাপের একজন গাইয়ে, পল্লী গানের সংগ্রাহক বাগানে কাজ করবে কেন ? ঘরের দেয়ালে টানানো একটি ছবির দিকে সাহেবের নজর পড়লো। হারমোনিয়াম সামনে নিয়ে একজন গান গাইছেন এই ছবিতে। লোকটার সাথে তার চেহারার মিল আছে। ভুল ভাঙলো সাহেবের। ক্ষমা চেয়ে করমর্দন করলেন আব্বাসের সাথে।

www.pathagar.com

সরলপ্রাণের এই মানুষটি ছেলেমেয়েদের সাফল্যে ভারি খুশি হন। তাদের জন্মদিনে, বিভিন্ন উৎসবকে সামনে রেখে কিংবা পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করলে বই এনে উপহার দেন তাদের। বাড়িতে যে সাহিত্য সভা বসে সেখানেও ছেলেদের কবিতা আবৃত্তি করতে হয়। কখনো বা প্রবন্ধ রচনা করে শোনাতে হয় অভ্যাগতদের। এমনি একটা সভাতে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ 'মেঘ-রৌদ্রের খেলা' নামে নিজের লেখা একটা কবিতা পাঠ করলেন। তার উপর তাৎক্ষণিক আলোচনার দায়িত্ব পড়লো বড় ছেলে মোস্তফা কামালের উপর। কলেজ পড়ুয়া ছাত্রটি এতো সুন্দর করে কবিতাটির সূক্ষ বিচার বিশ্লেষণ করলেন যে, রচয়িতা স্বয়ং মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি কেবলই ভাবতে লাগলেন, কবিতাটি রচনার সময় এইসব দিক তার মনে আসেনি কেন।

মেয়ে ফেরদৌসী সেবারে মেট্রিক পরীক্ষায় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করলেন। মেয়ের কৃতিত্বে আব্বাসের খুশি আর ধরে না। সবাইকে খবর দিতে লাগলেন ছেলে মানুষের মতো। বললেন,–আজ বাবা যদি বেঁচে থাকতেন কতো খুশিই না হতেন মেয়েটা পড়াশুনায় এতো ভালো করলো বলে।

দীর্ঘদিন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে আসছে আব্বাসউদ্দীনের বাড়িতে। ঘরোয়া এই অনুষ্ঠানের কোনো নাম নেই। একজন সাহিত্যিক তাই প্রস্তাব রাখলেন আনুষ্ঠানিক একটা নাম দেয়ার জন্য।

প্রস্তাবটা মনপুত হলো সবার। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। গঠিত হলো 'পাকিস্তান মজলিশ'। ক্রমে ক্রমে এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়লেন কবি গোলাম মোস্তফা, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কবি মঈনুদ্দীন, মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, ইব্রাহীম খাঁ, মুজিবুর রহমান খাঁ, কবি ফররুখ আহমেদ, কবি তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আশরাফ, কবি আবদুল কাদির, ইজাবউদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, কবি আজিজুর রহমান আরো অনেকে।

বরিশালে সাহিত্য সম্মেলন। ঢাকার নামকরা কবি-সাহিত্যিকগণ দাওয়াত পেলেন। ঢাকা থেকে বরিশাল যেতে হলে নদী পথ ছাড়া গত্যন্তর নেই। কথায় বলে নদ নদী খাল–এই তিনে বরিশাল।

স্টীমার ছাড়লো নারায়ণগঞ্জ থেকে। দ্বিতীয় শ্রেণী রিজার্ভ করে চলেছেন কবি সাহিত্যিকগণ। দলে আছেন মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, বেগম শামনুন নাহার, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি মঈনুদ্দীন, ডক্টর নীলিমা ইব্রাহীম, মাহবুবা রহমান, শোভাদে প্রমুখ। আব্বাসউদ্দীনও আছেন দলে।

www.pathagar.com

নানা গল্প করতে করতে রাত গভীর হয়ে গেলো। ঘুমাবার জন্য উঠি উঠি করছেন অনেকে। বাইরে ভরা জ্যোৎসনায় হেসে উঠেছে প্রকৃতি। রোমাঞ্চকর এই মুহূর্তে সবাই ধরে বসলো আব্বাসকে। গান শোনাতে হবে তাদের।

নিয়ে আসা হলো হারমোনিয়াম। আব্বাসউদ্দীন ধরলেন ভাওয়াইয়া। চলন্ত স্টীমারে নদীর বুকে তার সুর প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো ঢেউয়ের সাথে সাথে। অপূর্ব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করলো তা। এক একটা গান শেষ হয় আর শ্রোতারা আর একটি গান ধরার অনুরোধ জানান। এইভাবে কখন যে রাত ভোর হয়ে এলো বুঝতে পারলেন না কেউ।

বরিশাল থেকে ফিরে আব্বাস একটা সুসংবাদ পেলেন। এতোদিন তিনি এদেশের মানুষকে গান শুনিয়ে মোহিত করেছেন। এবারে যেতে হবে তাকে বিদেশে। নতুন এই দেশকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে পরিচিত করাতে হবে। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলাতে আয়োজন করা হয়েছে দক্ষিণ পূর্ব এশীয় সংগীত সম্মেলনের। এই সম্মেলনে যোগদান করার জন্য প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে পাঠানো হলো আব্বাসউদ্দীনকে। সাথে তার সেই ব্লটিং পেপার লায়লা আঞ্জুমান্দ বানু। তবলায় সহযোগিতার জন্য মোহাম্মদ হোসেন।

সম্মেলনে আব্বাসউদ্দীনকে পূর্ব বাংলার গানের ধারা বিশ্লেষণের জন্য অনুরোধ জানানো হলো। পূর্ব বাংলার গান মানেই ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, দেহতত্ব, বিচ্ছেদী, মুর্শিদী, কীর্তন ইত্যাদি। এই সব গানের উপরে আধা ঘন্টা ধরে তিনি বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার মাঝে মাঝে লায়লাকে নিয়ে গান গেয়ে শোনালেন। শ্রোতারা ভারি মুগ্ধ হলো গান আর বক্তৃতা এক সাথে শুনে। অন্যান্য দেশের বক্তারা তাদের বক্তব্যের পরে রেকর্ডের মাধ্যমে গান শুনিয়েছেন। শিল্পীর কণ্ঠে সরাসরি শোনা আর রেকর্ডকৃত গান শোনা এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। তারপর গানের সাথে তবলা বাজানো। তবলা জিনিসটা অনেকেই আগে দেখেনি। এর টুং টাং ছন্দবদ্ধ শব্দ কানে মধুর লেগেছে তাদের। মঞ্চ থেকে আব্বাস যখন নামলেন করতালিতে হলঘর ফেটে পড়ার মতো অবস্থা।

ফিলিপাইনের মেয়ে মিস কাসিলাগ। নিজস্ব উদ্যোগে একটা সংগীত একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। তার উদ্যোগে সরকারও সাহায্য করেছেন। আব্বাসকে তার একাডেমীতে দাওয়াত দিলেন কাসিলাগ।

সংগীত একাডেমীটা দেখে আব্বাস মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সাউন্ড প্রুফ ছোট ছোট এক একটি ঘর। সেই ঘরে একটা বা দু'টি শিক্ষার্থী বসে সুর সাধনা করছে। প্রাণভরে চিৎকার করে, গলা ছেড়ে গান গেলেও পাশের রুমে কোনো

www.pathagar.com

শব্দ যাচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য হোস্টেল আছে। রয়েছেন পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষকও।

আব্বাসউদ্দীনের মনে পড়লো দেশের কথা। পাকিস্তান সৃষ্টির পর একটা সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কতো চেষ্টাই না করেছেন। সরকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি কতো মন্ত্রণালয়ে না তিনি যোগাযোগ করেছেন। কতো জন শিক্ষক লাগবে, কতো টাকার প্রয়োজন হবে এইসব তথ্য জানতে চেয়ে প্লান দাখিলের জন্য তাকে বলা হয়েছে। অনেক খাটাখাটনি করে তিনি চাহিদা মোতাবেক প্লান দাখিল করেছেন। কিন্তু ঐ দাখিল পর্যন্তই। কোনো কার্যকর পদক্ষেপ আর নেয়া হয়নি সরকারী পর্যায়ে। সেই তুলনায় কতো এগিয়ে রয়েছে ফিলিপাইন।

ম্যানিলা থেকে আব্বাসউদ্দীন এলেন হংকং। সুন্দর এই শহরটা মুগ্ধ করলো তাকে। এবারে এলেন রেঙ্গুন। সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনে তাদের অভ্যর্থনা জানানো হলো। সন্ধ্যায় বসলো সংগীত জলসা। রেঙ্গুনে অনেক বাঙালী বাস করেন। হলে তিল ধারণের স্থান নেই। অনেক রাত অবধি সংগীত পরিবেশন করতে হলো। বিদেশে এতো আন্তরিকতা পেয়ে মনে হলো তার তিনি যেন ঢাকাতেই আছেন। পরদিন রেঙ্গুন থেকে সোজা চলে এলেন ঢাকা।

এক বছরের মাথায় আবার তাকে যেতে হলো বিদেশে। প্রথমে গেলেন ইরাকের রাজধানী বাগদাদ। হযরত বড় পীর সাহেবসহ বড় বড় আওলিয়ার মাজার রয়েছে এই শহরে। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো তার। প্লেন উড়লো লেবাননের রাজধানী বৈরুতের উদ্দেশ্যে। নিচে দেখা যাচ্ছে বড় বড় মসজিদের মিনার। তারপর একসময়ে ধূ ধূ মরুভূমি। আরব এলাকা। এখানে চৌদ্দ শো বছর আগে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসুলুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশদের অত্যাচার তিনি সহ্য করেছেন। কিন্তু পিছপা হননি সত্য ধর্ম ইসলাম প্রচার থেকে। তার জীবদ্দশাতেই শান্তির ধর্ম ইসলাম এই আরব উপদ্বীপে বিস্তার লাভ করেছে। সেই স্বপ্নের মক্কা আর মদিনার কতো কাছে তিনি। ইস্ তার যদি পাখা থাকতো উড়ে যেতেন তিনি মদিনায়। জিয়ারত করতেন মহানবীর পবিত্র রওজা। দেখে আসতে পারতেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘর কাবাঘরকে। সারা জীবন তিনি যে সংগীত সাধনা করেছেন তা প্রধানত মহানবীকে, তাঁর সত্য ধর্ম ইসলামকে গণমানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যই।

আব্বাসউদ্দীন যখন গান করেন, নবী প্রেমে ভেজা থাকে তার চোখ। গান করছেন তিনি চোখ বুজে, অন্তরের চোখে ছবি আঁকছেন কাবা ঘরের। একটা অমীয় বাণীকে আশ্রয় করে তিনি তার কর্মময় জীবন অতিবাহিত করে চলেছেন। বাণীটি—

www.pathagar.com

বক্ষে আমার কাবার ছবি
চক্ষে মোহাম্মদ রাসুল।

সেই রাসুলের পবিত্র মাজার, সেই পবিত্র কাবাঘরের কতো কাছেই না তিনি। চোখ বুজে অন্তরের চোখে দেখতে পেলেন তিনি যেন কাবা ঘরকে। নবী প্রেমে দুচোখ ভরে পানি এলো তার।

বৈরুত থেকে এলেন রোমে। এক সময়ে শিল্প-সাহিত্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, স্থাপত্য শিল্পে রোম ছিল পৃথিবী সেরা। রোম থেকে জুরিখ, সেখান থেকে জার্মানীর স্টুটগার্ট।

প্লেন থেকে নেমে আব্বাসউদ্দীন দেখতে পেলেন তার বড় ছেলে মোস্তফা কামাল এয়ারপোর্টে এসেছেন তাকে নেয়ার জন্য। বিদেশ-বিভূইয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে ছেলেকে দেখতে পেয়ে আকাশ হাতে পেলেন আব্বাসউদ্দীন। তার পিতার বড় শখ ছিল আব্বাস ব্যারিস্টারী পড়বেন। তা আর পূর্ণ হয়নি। আব্বাস তাই তার বড় ছেলেকে ব্যারিস্টারী পড়তে পাঠিয়েছেন লন্ডনে। পিতা জার্মানীতে এসেছেন এই সংবাদ পেয়ে লন্ডন থেকে এসেছেন তিনি।

সুন্দর একটা গাড়ি নিয়ে আরো একটা সুন্দর মেয়ে তাদের পৌঁছে দিতে চাইলো হোটেল পর্যন্ত। পিতা-পুত্র চড়ে বসলেন মেয়েটির গাড়িতে।

—এতো দ্রুত চালাচ্ছো কেন গো মেয়ে। একটু আস্তে চালাও। অনুরোধ করলেন আব্বাস মেয়েটিকে।

—কেন, ভয় করছে কি ?

—ভয় নয়। তোমাদের শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা দু'চোখ ভরে দেখতে চাই। ভারি সুন্দর তোমাদের দেশটি।

—আমাদের দেশের প্রশংসা করলে, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

—প্রশংসা না করে থাকি কি করে ? আসার সময় সুইজারল্যান্ড দেখে এলাম। প্রকৃতির লীলা নিকেতন বলে সুইজারল্যান্ড বেশ পরিচিত। এখন দেখছি তোমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সুইজারল্যান্ডকে হার মানায়। সুইজারল্যান্ড আর জার্মানী এরা যেন দুই যমজ বোন।

এই তুলনায় খিল খিল করে হেসে উঠলো মেয়েটি। তারপর সে এক সময়ে পৌছে দিল তাদের হোটেলে।

জার্মানীর স্টুটগার্ট শহর। এই শহরটি ছাপাখানা ও পুস্তক প্রকাশনার জন্য বিখ্যাত। সারা জার্মানীর প্রকাশনা ব্যবসা এই শহরে এসে যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আব্বাসের মনে ধরলো বিষয়টি। শুধু বইয়ের জন্য এই একটি শহর পৃথিবীর বুকে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের প্রতি ছোটবেলা থেকেই তার

www.pathagar.com

দুর্বলতা। সংগীতের জন্য সময় দিতে যেয়ে সাহিত্য চর্চা করা আর হয়ে ওঠেনি। সংগীত জীবনে তিনি অনেক কিছুই পেয়েছেন। এখন সাহিত্য সাধনা করা যায়। প্রথমে তিনি তার অতীতের গৌরবময় জীবনের স্মৃতিচারণ করবেন ঠিক করলেন। আর অপেক্ষা নয়। ঢাকায় ফিরে এই কাজে হাত দিবেন তিনি। তার ভাবনাগুলো সাহিত্যের সাধ্যমে সঞ্চারিত করে রাখবেন লক্ষ মানুষের অন্তরে।

স্টুটগার্ট শহর থেকে ট্রেনে করে এলেন ট্রেসিংগান শহরে। সম্মেলন বসবে এখানে।

২৬শে জুলাই উদ্বোধন করা হলো আন্তর্জাতিক পল্লী সংগীত সম্মেলন। সম্মেলন চলবে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত।

সম্মেলনের শেষ দিনে আব্বাসউদ্দীনের বক্তৃতা। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সমবেত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, তার ছেলে তার হয়ে বক্তৃতা পড়বে এবং বক্তৃতার মাঝে মাঝে তিনি গান গেয়ে শোনাবেন।

তাই হলো। মোস্তফা কামাল ঢাকা থেকে পিতার তৈরি করে নিয়ে যাওয়া বক্তৃতা পড়তে লাগলেন এবং বক্তৃতা যাতে একঘেয়ে না হয়ে যায় সেজন্য আব্বাসউদ্দীন গান গাইলেন। বক্তব্যের মাঝে মাঝে গান গেয়ে বক্তব্যকে দৃঢ় করা-এমন সুন্দর উপস্থপনা এই সম্মেলনে আর হয়নি। বোদ্ধা দর্শক আর শ্রোতাবৃন্দ তাই অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন আব্বাসউদ্দীনকে।

গান শেষ হলো। প্রশ্ন আসতে লাগলো নানা দিক হতে। পিতা পুত্র তার জবাব দিলেন। হাততালিতে মুখরিত হয়ে উঠলো হলঘর।

সম্মেলনের ইতি টানলেন মিস মড কার্পেলস। আব্বাসউদ্দীনের বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়েই তিনি শেষ করলেন তার বক্তৃতা। গ্রামের মানুষ অতি সাধারণ, সাধারণ মানুষের চিন্তাধারাও সাধারণ এবং এজন্যই তারা প্রাণবন্ত-সম্মেলনের মূল বক্তব্যই এটা।

ঢাকায় ফিরে আব্বাসউদ্দীন কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেলেন। প্লেনে চড়ে তিনি যে এতো পথ পাড়ি দিলেন, এক দেশ থেকে অন্য দেশে গেলেন মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে। বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষতা তাকে ক্ষণে ক্ষণে মনে করিয়ে দিলো চৌদ্দশো বছর আগে মহানবীর(সঃ) মিরাজে যাওয়ার কথাটি। এদিকে শরীর যে একটু অসুস্থ তা তিনি তার ছেলে মেয়েদের বুঝতে দেন না। তার জন্য আর কেউ চিন্তা করুক, তাকে নিয়ে আর কেউ বিব্রত হোক একেবারেই তার পছন্দ নয়। আগের মতো সভা-সমিতিতে আর গান করেন না। তার বর্ণাঢ্য জীবনের স্মৃতিচারণ শুরু করলেন তিনি। পরিচ্ছন্ন আর চমৎকার বর্ণনায় তা হয়ে উঠলো অপূর্ব, অতি সুখপাঠ্য।

www.pathagar.com

অসুস্থতা যেন বেড়ে যেতে লাগলো দিনদিন। পিতার এই চুপচাপ থাকাটা যেন অস্বাভাবিক মনে হলো মেয়ে ফেরদৌসীর। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। পরীক্ষা করে মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো ডাক্তারের। তার মনে হলো পক্ষাঘাত রোগের প্রাথমিক লক্ষণ। হলোও তাই। আস্তে আস্তে অবনতি হতে লাগলো তার স্বাস্থের। একটি পা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বাম হাতটাও আক্রান্ত হলো। শেষে অবস্থা এমন হলো যে দুরারোগ্য এই ব্যাধির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন বাংলার কোকিল।

মোস্তফা কামাল বিদেশে। ব্যারিস্টারী পড়া শেষ হয়নি তার। আব্বাসউদ্দীন তাকে অসুস্থতার খবরটা দিতে নিষেধ করলেন। পিতার সুস্থতার জন্য তিনি বি, এ পাশ বিসর্জন দিয়েছিলেন। পিতার অসুস্থতার খবর পেলে মোস্তফা কামালও হয়তো উৎকণ্ঠায় ফিরে আসবে দেশে। তার এই দুরারোগ্য ব্যাধি তো একদিনে উপশম হবার নয়। ছেলে যে পিতা অন্ত প্রাণ দেশে ফিরে এলে আর ফিরে যাবেন না লন্ডনে। ব্যারিস্টারী পাশ করা হবে না হয়তো। তার পিতার যে স্বপ্ন ছেলের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন বিফল হয়ে পড়বে তা। তাই লন্ডনে ছেলের কাছে একপ্রকার গোপন রাখা হলো পিতার অসুস্থতার খবরটি।

মোস্তফা জামান আব্বাসী আর ফেরদৌসী পিতাকে সঙ্গ দেন। ভাই-বোন ইতোমধ্যে রেডিওর শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। সামনে ফেরদৌসীর এম, এ পরীক্ষা। পিতা উৎসাহ আর উদ্দীপনা যুগিয়েছেন তাকে এ পর্যন্ত আসতে।

মোস্তফা কামালের ব্যারিস্টারী পড়া শেষ হলো। ফিরে এলেন তিনি দেশে। পিতা যেন তার ফেরার অপেক্ষাতেই প্রহর গুণছিলেন। অসুস্থতার দিনগুলোতে তিলে তিলে তিনি তার জীবনের স্মৃতিচারণ করেছেন। পান্ডুলিপিটা উঠিয়ে দিলেন ছেলের হাতে। এটা নিছক তার আত্মচরিত নয়, এটা তার সময়ের ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের নান্দনিক দলিল।

মোস্তফা কামাল পান্ডুলিপিটার পাতা উল্টান আর বিস্মিত হন। পিতার স্মরণ শক্তি যে প্রখর তা তার জানা ছিল। কিন্তু তা যে এতো অসাধারণ তা জানা ছিল না। ব্যক্তি জীবনে কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে, চলনে-বলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি যেরূপ পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত সাহিত্যেও পড়েছে তার প্রতিফলন। গোটা গোটা অক্ষরে প্রতিটি ঘটনা পরিচ্ছন্ন রুচির সাথে তুলে ধরেছেন তিনি তার আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' পান্ডুলিপিতে।

এই অসুস্থ অবস্থাতেও আব্বাসউদ্দীন তার ডাইরীতে ২৬-৯-৫৯ তারিখে লিখেছেন "দুদিন পরে আমি যখন ধরার আনন্দ কোলাহল থেকে চিরদিনের

www.pathagar.com

মতো চলে যাবো তখন তো দুনিয়াই আমাকে ভুলে যাবে। আমি ফুটেছিলাম দিনকয়েক হেসেছিলাম-এবার ঝরার পথে-ঝরব, কিন্তু আর ফুটবো না।"

আব্বাসউদ্দীনের সাহিত্যিক বন্ধুরা জানতেন তিনি আত্মজীবনী লিখছেন। অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তা ছাপাবার। কিন্তু কেন যে তার মনে হয়েছে দায়িত্বটি তিনি বড় ছেলেকে দিবেন। মোস্তফা কামালকে এবারে তিনি অনুরোধ জানালেন বইটা ছাপার অক্ষরে পাঠকদের হাতে উঠিয়ে দিতে। চেষ্টাও চলতে লাগলো সেভাবে।

অতঃপর এলো সেই বিষাদের দিন। ১৯৫৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর। খুব ভোরে তার অবস্থার অবনতি হলো। মার ডাকে তড়িঘড়ি করে উঠলেন মোস্তফা জামান আব্বাসী। এলেন পিতার ঘরে। দেখলেন হত বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফেরদৌসী, বড়ভাই মোস্তফা কামাল। পিতার শীর্ণ হাতখানা উঠিয়ে নিলেন আব্বাসী বুকের গভীরে। অতি কষ্টে নিঃশ্বাস উঠছে। এক সময়ে তাও বন্ধ হয়ে গেলো। ঘড়িতে তখন সকাল সাতটা বিশ মিনিট। 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' আর উঠিয়ে দেওয়া হলো না অগণিত পাঠকের হাতে। তার আগেই 'জীবনের কথা' ফুরালো তার। চলে গেলেন মহামহীম রাব্বুল আল আমীনের দিদার লাভ করার জন্য। কাঁদিয়ে গেলেন সারা বাংলার সংগীত প্রেমিকদের। তার অভাব পুরণ হবার নয়। তার অন্যান্য সব অবদান বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেলেও যতোদিন বাংলাদেশের মুসলমানদের ঘরে ঈদুল ফিতর পালিত হবে ততোদিন নজরুলের সাথে সাথে আব্বাসউদ্দীনের নামও উচ্চারিত হবে ঐ গানের জন্য

'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ'।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ
বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com